দাম : ষোলো টাকা

সঙ্ঘজননী মা সারদা
— পৃঃ ৩১

স্বস্তিকা

লোকশিক্ষিকা মা সারদা
— পৃঃ ৪৩

৭৭ বর্ষ, ১৫ সংখ্যা।। ১৬ ডিসেম্বর, ২০২৪।। ৩০ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১।। যুগাব্দ - ৫১২৬।। website : www.eswastika.com

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৭ বর্ষ ১৫ সংখ্যা, ৩০ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

১৬ ডিসেম্বর - ২০২৪, যুগাব্দ - ৫১২৬,

Website : www.eswastika.com

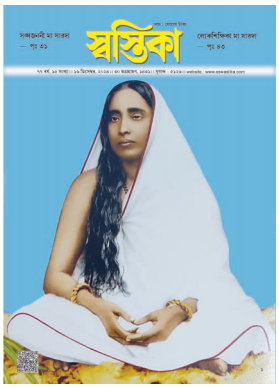

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

কিল মারার গোঁসাই মমতা আর স্যাঙাত বাম কুরুচির কুরুসভা □ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

চপ শিল্পের উন্নয়ন বন্ধ রাখুন মুখ্যমন্ত্রী □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

সরাসরি হস্তক্ষেপ না করলেও বাংলাদেশ প্রশ্নে আমেরিকাকে চাপ দিতে পারে ভারত □ স্বপন দাশগুপ্ত □ ৮

সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকে প্রাধান্য দিয়েই দেশের সংবিধান চলবে, স্পষ্ট মত বিচারপতির □ বিশ্বামিত্র □ ১০

চিন্ময় প্রভুর গ্রেপ্তারের পরও কি ভারত সরকার চুপ করে বসে থাকতে পারে? □ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী □ ১১

হাসিনা পরবর্তী বাংলাদেশ হিন্দুশূন্য করার ছক □ খগেনন্দ্রনাথ মণ্ডল □ ১৩

বাংলাদেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ আসন্ন দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে দেশ □ সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী □ ১৫

বিচারব্যবস্থার অসহায়তা এবং মোল্লাবাদীদের দাপাদাপি □ ধর্মানন্দ দেব □ ১৭

১৬ ডিসেম্বর ১৯১৭—১৬ ডিসেম্বর ২০২৪ □ গোপাল চক্রবর্তী □ ১৮

মা সারদা এক অনন্য মাতৃত্বের অধিকারিণী □ পারমিতা গুপ্ত □ ১৯

মা সারদার দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ □ পারুল মণ্ডল সিংহ □ ২৩

শ্রীশ্রী মা সারদা এবং তাঁর আদরের খুকি □ নিবেদিতা কর □ ২৪

সঙ্ঘজননী মা সারদা □ সারদা সরকার □ ৩১

গ্রামবাঙ্গলার হারিয়ে যাওয়া এক ঐতিহ্যল ঢেঁকি □ বৈশাখী কুণ্ডু □ ৩৪

মা সারদার দক্ষিণেশ্বরের নহবতের জীবন □ ড. অলি ব্যানার্জি □ ৩৫

সবার মা □ সুনন্দিনী শুক্লা □ ৩৭

জগজ্জননী মা সারদা □ মিতা রায় □ ৩৮

লোকশিক্ষিকা মা সারদা □ ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় □ ৪৩

শ্রীশ্রীমায়ের তীর্থযাত্রা □ সাধ্বী সুমিত্রাম্বা (মিতা মা) □ ৪৬

নিয়মিত বিভাগ :

□ অঙ্গনা : ২১ □ সুস্বাস্থ্য : ২২ □ সমাবেশ সমাচার : ২৬-৩০ □ অন্যরকম : ৩৯ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ □ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৯-৫০

প্রকাশিত হবে ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৪

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৪

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

ভারতীয় আঙ্গিকে বড়দিন

খ্রিস্টমতের অনুসারীরা যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন হিসেবে খ্রিস্টীয় উৎসব বড়দিন পালন করেন। কিন্তু এই দিনটি যিশুর প্রকৃত জন্মদিন কিনা তা প্রমাণিত নয়। বহু ভারতবাসীও দিনটি উৎসবের মেজাজে হই-হুল্লোড়ের সঙ্গে পালন করেন। তারা একবার মনেও করেন না যে দিনটির ভারতীয় মাধুর্যও রয়েছে।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় ভারতীয় আঙ্গিকে দিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করবেন ড. অলি ব্যানার্জি, ড. কল্যাণ চক্রবর্তী, শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী, দেবজিৎ সরকার, মিলন খামারিয়া প্রমুখ।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(যারা ডাকযোগে স্বস্তিকা নিচ্ছেন তাদের জন্য)

যাঁরা শুধুমাত্র ৭০০ টাকা দিয়ে বার্ষিক গ্রাহক হচ্ছেন তাঁদের স্বস্তিকা সাধারণ ডাকের মাধ্যমে নিয়মিত পাঠানো হচ্ছে। এক্ষেত্রে অনেকেই অভিযোগ করছেন ডাকবিভাগ ঠিকমতো তাঁদের স্বস্তিকা সরবরাহ করছে না। এই কারণেই দু'টি বিশেষ প্রকল্প শুরু করা হয়েছে, যাতে ডাকযোগের গ্রাহকরা নিশ্চিতরূপে তাঁদের স্বস্তিকা পেতে পারেন।

১০৬০ টাকার বিনিময়ে (গ্রাহক মূল্য ৭০০/- + ৩৬০/- রেজিস্ট্রি খরচ) বার্ষিক গ্রাহক করার একটি প্রকল্প শুরু করা হয়েছে, যাতে স্বস্তিকা নিশ্চিতভাবে গ্রাহকের হাতে পৌঁছায়। এক্ষেত্রে প্রতি মাসের পত্রিকা একত্রে একবার রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

১৫৫০ টাকার বিনিময়ে (গ্রাহকমূল্য ৭০০/- + ৮৫০/- রেজিস্ট্রি খরচ) বার্ষিক গ্রাহক করার আরও একটি প্রকল্প শুরু করা হচ্ছে, যাতে গ্রাহক তাদের স্বস্তিকা রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রতি সপ্তাহে নিশ্চিতভাবে পেতে পারেন।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সত্যিকারের মা

ভারতীয় সংস্কৃতিতে মাতার স্থান সর্বোচ্চ। স্বর্গের চাইতেও উচ্চস্থানে। তৈত্তিরীয় উপনিষদের শিক্ষাবল্লীর একাদশ শ্লোকে প্রথমেই উচ্চরিত হইয়াছে, মাতৃ দেবো ভবঃ। শাস্ত্রে বলা হইয়াছে, মাতা-পিতা একসঙ্গে উপস্থিত হইলে জ্ঞানবান সন্তান প্রথমে মাতারই চরণবন্দনা করিবে। কারণ মাতা দশমাস দশদিন গর্ভে ধারণ করেন, প্রসব করেন এবং পালন ও পোষণ করেন। সেইহেতু ত্রিভুবনে মাতার সমকক্ষ কোনো গুরু নাই। সংস্কৃত শ্লোকে বর্ণনা রহিয়াছে— পিতুরপ্যধিকা মাতা গর্ভধারণপোষণাৎ অতো হি ত্রিষু লোকেষু নাস্তি মাতৃসম গুরুঃ। বিশ্বজগতের যাহা কিছু হইতে মনুষ্যজাতি উপকৃত হইয়াছে, ভারতীয় সংস্কৃতি তাহাতেই মাতৃত্ব আরোপ করিয়াছে। যেমন, ভূমাতা, গোমাতা, প্রকৃতিমাতা, গঙ্গামাতা। ইহাই ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। এই সংস্কৃতিতে স্ত্রীজাতিকে মাতা অভিধায় ভূষিত করা হইয়াছে। প্রসব না করিলেও স্ত্রীজাতি মাতা সম্মানের অধিকারিণী। মাতা যশোদার নাম ভারতীয় সংস্কৃতিতে অমর হইয়া রহিয়াছে। যদিও তিনি শ্রীকৃষ্ণের পালকমাতা। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন, মাতা যশোদাই তাঁহার সত্যিকারের মাতা। ইতিহাসে এইরূপ বহু পালকমাতা সত্যিকারের মাতার স্থান অধিকার করিয়াছেন। আধুনিককালের ইতিহাসে এইরূপ এক মাতা হইলেন শ্রীরামকৃষ্ণ সহধর্মিণী, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘজননী মা সারদা। তিনি সন্তান প্রসব না করিয়াও শত শত সন্তানের জননী। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার মধ্যে জগজ্জননী মা কালীর অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। তাই তিনিও তাঁহাকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করিয়াছেন। মাতা সারদা শুধুমাত্র তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর নহে, আপামর মানুষের মাতার স্থান অধিকার করিয়াছেন। যাহারা তাঁহার আশ্রয় লইয়াছে, সান্নিধ্যে আসিয়াছে, তাহাদের সকলকে তিনি আপন পুত্রবৎ স্থান দিয়াছেন। ঈশ্বরাভিমুখী করিয়াছেন। পাপী তাপী সকলেই তাঁহার মাতৃস্নেহে সিক্ত হইয়াছে। সকলকেই তিনি জীবনের পাঠ প্রদান করিয়াছেন। তিনি দয়াময়ী। সর্বজীবের প্রতি তাঁহার অসীম দয়া। অসীম করুণা। তিনি আধুনিক যুগে মাতৃত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। সমগ্র রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ তাঁকে কেন্দ্র করিয়াই আবর্তিত হইতেছে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে 'জ্যান্ত দুর্গা' বলিয়া মনে করিতেন। সমগ্র কার্যে তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন। মাতা সারদাও স্বয়ং বলিয়াছেন, তিনি সকলের মা, গুরুমাতা নহেন, পাতানো মাতা নহেন, সত্যিকারের মাতা। বলিয়াছেন, তিনি সকলের মা। যাহারা আসিয়াছে, তাহাদেরও মা। যাহারা আগামীতে আসিবে তাহাদেরও মা।

বর্তমান সময়ে মা সারদার ন্যায় প্রকৃত মাতার প্রয়োজন পড়িয়াছে। চতুর্দিকে অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, ব্যাভিচার দৃষ্টিগোচর হইতেছে। মাতৃজাতির প্রতি অবমাননা নিরন্তর ঘটিতেছে। মানবতা ভূলুণ্ঠিত হইতেছে। সমাজবিদগণ বলিতেছেন, প্রকৃত শিক্ষার অভাবেই এইরূপ ঘটিতেছে। প্রকৃত শিক্ষার অভাব ঘটিয়াছে, কারণ প্রকৃত মাতার অভাব হইয়াছে। বর্তমানকালে বৃহদংশ মা শুধু সন্তান প্রসব করিতেছেন। সন্তানকে প্রকৃত শিক্ষাদান করিতেছেন না। সন্তানদিগের শিক্ষিকার ভূমিকা তাহারা গ্রহণ করিতেছেন না। ভোগবাদী সংস্কৃতিতে তাহারা আচ্ছন্ন। তাই তাহাদের সন্তানরা পরিবেশ কলুষিত করিতেছে। তাহাদের কেহ মা সারদার নামে চিটফান্ড খুলিয়া মানুষের সর্বস্বান্ত করিতেছে। কেহ কেহ চাকুরি চুরি, খাদ্য চুরি, গরিব মানুষের গৃহ নির্মাণের টাকা চুরি অবাধে করিয়া চলিয়াছে। তাহাদেরই কেহ আবার কোনো এক নেত্রীকে মা সারদার আধুনিক অবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়া মাতৃনামে কলঙ্ক লেপন করিতেছে। আজিকার এই ঘোর দুর্দিনে মাতাঠাকুরানির পুনরায় আবির্ভূত হইবার প্রয়োজন পড়িয়াছে। তাঁহার জন্মতিথিতে ঐকান্তিক প্রার্থনা— ঘরে ঘরে প্রকৃত মাতার আবির্ভাব ঘটুক। মা সারদার ন্যায় সত্যিকারের মাতা। তাঁহাদের হস্তে সন্তানগণ প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হউক।

সুভাষিতম্

ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।। (শ্রীগীতা ২।৩)

হে অর্জুন! পৌরুষহীনতা প্রাপ্ত হয়ো না, তোমার এটা শোভা পায় না। হে পরন্তপ! হৃদয়ের এই তুচ্ছ দুর্বলতা পরিত্যাগ করে যুদ্ধের জন্য উত্থিত হও।

কিল মারার গোঁসাই মমতা আর স্যাঙাত বাম

কুরুচির কুরুসভা

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

সংকট থেকে নজর ঘোরাতে রাজ্যের বিদেশি বামেরা আর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমান দক্ষ। আপাতত তাদের দুটি কাজ। বাংলাদেশে উৎকট মোল্লাবাদী অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে হিন্দু জাগরণের বিরোধিতা আর রাজ্যের মুসলমানদের সযত্নে পালন। মানে অস্বস্তিতে পড়তে না দেওয়া। বাংলাদেশের হিন্দু নিধন থেকে রাজ্যের মানুষের নজর ঘুরিয়ে রাখা। আর সেই ফাঁকে মুসলমান ভোট করায়ত্ত করা। তাই ইস্তাহার বনেছে। তাতে নারী নির্যাতন আর অপ্রাসঙ্গিক অর্থনৈতিক বঞ্চনার কথা রয়েছে। আরজি কর আন্দোলনকে সাফল্যের সঙ্গে তিনটি পরস্পরবিরোধী ধারা তৈরি করে গলা টিপে মারা হয়েছে— আদালত, প্রশাসন আর পুলিশ। উভয়ের প্রধান শত্রু রাষ্ট্রবাদী বিজেপি। বিজেপি যাতে রাজ্যের হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতি আর ভাবধারা উদ্ধার করতে না পারে তা আটকাতে বাম-মমতা এক পায়ে খাড়া।

বাংলাদেশ নিয়ে অপরিসীম দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছে মমতা সরকার। বাম-কং-মমতার ত্রিকোণ চক্র মানুষের চোখে ঠুলি পরিয়ে রেখেছে লোকহিতৈষণার ভুয়ো স্লোগানের নামে। তাদের বিভাজনের রাজনীতি ঢাকতে তারা বিজেপিকে বিভাজনকারীর দুর্নাম দেয়। কিছু তাত্ত্বিক 'যদি দ্রৌপদী না হতো' ধরনের মহাভারত ব্যাখ্যা করেছেন। মানে কুরুসভায় পাঞ্চালির অপমান না হলে মহাভারত লেখা হতো না। ১৮ পর্বের মধ্যে ৪টি যুদ্ধপর্ব। অথচ তাদের মতে দ্রৌপদী কেবল মহাভারতের নায়িকা। মহাভারতকে কেবল যুদ্ধগ্রন্থ বলবে বলেই পশ্চিমিরা মহাকাব্যের এই সব আজগুবি ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। মহাভারতের মতো এই রাজ্যেও 'কুরুচির কুরুসভা' বসিয়েছেন মমতা। কেবল তিনি কিল মারার গোঁসাই। একাধারে সাক্ষী, আইন আর বিচারক।

হিন্দু নিধনের কারিগর বাংলাদেশের অবৈধ অন্তর্বর্তী ইউনুস সরকার। তা নিয়ে কোনো কথা ব্যয় না করে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকারের কোর্টে বল ঠেলেছেন মমতা। কথায় ফাঁক রেখে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত শিরোধার্য। পরিষ্কার করে বলেননি যে বাংলাদেশের হিন্দু আর সংখ্যালঘুদের প্রতি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সে পদক্ষেপ মানবেন কিনা। অন্যায় থামাতে শীঘ্র কী পদক্ষেপ হতে পারে তার সুপারিশ বা আলোচনা চাননি। এটাই মমতার ছলচাতুরি। হাস্যকর আর এক্তিয়ার বহির্ভূত ভাবে আজগুবি প্রস্তাব দিয়ে বাংলাদেশে শান্তিসেনা পাঠানোর কথা বলেছেন। ২০১২-র রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তিনজন প্রার্থীর নাম দেন মমতা— সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, আবদুল কালাম আর গোপাল গান্ধী। তাদের সঙ্গে আলোচনা না করেই তিনটি আজগুবি নাম দেন।

২০২৬-এর বিধানসভার ভোটকে নজরে রেখে কুরুসভার পঞ্চগুরু ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য, শল্য ও অশ্বত্থামার মতো বাংলাদেশের দুর্যোধনরূপী মহম্মদ ইউনুসের সব অন্যায় মাথা পেতে মেনে নিচ্ছেন মমতা।

বাংলাদেশে শান্তিসেনা পাঠানো সেরকম একটি আজগুবি কথা।

রাজ্যের মুসলমান ভোটারদের ঠিকাদারি নিয়েছেন মমতা। সহ-ঠিকাদারির জন্য মারামারি করছে কংগ্রেস আর সিপিএম। মমতার অ্যালার্জি কংগ্রেসে। তাই মাজা ভাঙা আর ক্ষয়ে যাওয়া সিপিএম তার শত্রু নয়। তাকে নিয়েই হয়তো মমতা চলতে চান 'হিন্দু বিজেপির' ধ্বংস অভিযানে। আগামীদিনে রাজনৈতিক স্বার্থে ইসকন আর সনাতনী হিন্দুরা যে আলাদা, মমতা এই বিভাজনের কথা বললে অবাক হব না। তাঁর মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন মুসলমান না হয়ে জন্মগ্রহণ গ্রাহ্য নয়। মমতা কলকাতার ইসকনে কথা বলেছেন। কী তা কেউ জানে না।

বিজেপি সংখ্যাগুরু হিন্দুদের অধিকারের প্রতিষ্ঠা চায়। মমতা আর তাঁর স্যাঙাতরা তার ভুল ব্যাখ্যা করে বলতে চায় তা কেবল মুসলমান আর খ্রিস্টানদের অনিষ্ট করে সম্ভব। আর তা যদি না হয় তাহলে মমতাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। ২০২৬-এর বিধানসভার ভোটকে নজরে রেখে কুরুসভার পঞ্চগুরু ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য, শল্য ও অশ্বত্থামার মতো বাংলাদেশের দুর্যোধনরূপী মহম্মদ ইউনুসের সব অন্যায় মাথা পেতে মেনে নিচ্ছেন মমতা। দুর্যোধনের নিপাত ঘটেছিল ১৮ দিনের মাথায়। মমতার নিপাত হবে কি ১৫ বছরে? অনেকের দাবি, মহাভারতের একটি দিন আসলে একটি বছর আর এই ১৮ সংখ্যা আসলে বর্ণমালার যার অর্থ হলো জয়। তাই মহাভারতের অন্য নাম জয়াখ্য বা জয় কাব্য। বাংলাদেশে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয় সকলের। মমতার কুরুচির কুরুসভার পণ্ড যে আসন্ন তা শীঘ্র বোঝা যাবে। □

চপ শিল্পের উন্নয়ন বন্ধ রাখুন মুখ্যমন্ত্রী

মুখ্যমন্ত্রীযু দিদি,

অনেকদিন পরে আপনাকে মুখ্যমন্ত্রী পরিচয়ে সম্বোধন করলাম। কারণ, আজকের চিঠি একেবারে মুখ্যমন্ত্রীকেই। আমার দিদিকে নয়। পশ্চিমবঙ্গে নতুন শিল্প আসে না। পুরনো শিল্প রাজ্যে থাকে না। এই অভিযোগ নিয়ে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে সরব বিরোধীরা। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী, এ কী তথ্য উঠে এল কেন্দ্রের রিপোর্টে?

সম্প্রতি সংসদে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের পক্ষে জানানো হয়েছে, ২০১৯ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে কতগুলি সংস্থা নিজেদের স্থায়ী ঠিকানা (রেজিস্টার্ড অফিস) অন্য রাজ্যে নিয়ে গিয়েছে। রিপোর্টে এ-ও বলা হয়েছে যে, ওই সংস্থাগুলির মধ্যে ৩৭টি শেয়ার বাজারে নথিভুক্ত।

বিজেপির সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য ওই বিষয়ে মোট চারটি প্রশ্ন জমা দিয়েছিলেন সংসদে। তিনি জানতে চান, ২০১৯ থেকে ২০২৪—এই পাঁচ বছরে কত সংস্থা ঠিকানা বদলে এই রাজ্য ছেড়ে অন্য রাজ্যে গিয়েছে? এর মধ্যে শেয়ার বাজারে নথিভুক্ত কতগুলি সংস্থা এবং সেগুলি কোন কোন ক্ষেত্রের? তৃতীয় প্রশ্ন ছিল, ওই সংস্থাগুলি পশ্চিমবঙ্গ থেকে সদর দপ্তর সরিয়ে নেওয়ার কারণ হিসেবে কী কী জানিয়েছে? চতুর্থ প্রশ্নে শমীকবাবু জানতে চেয়েছিলেন, এ বিষয়ে মন্ত্রক কী কী বদক্ষেপ করেছে, যাতে পশ্চিমবঙ্গে শিল্প সংস্থাকে নিয়ে আসা যায়।

সব প্রশ্নেরই জবাব দিয়েছেন কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী হর্ষ মলহোত্রা। তিনি লিখিত বিবৃতিতে জানিয়েছেন, ভারতের কোম্পানি আইনের ১৩(৪) ধারা অনুযায়ী যে কোনো সংস্থাই তাদের ঠিকানা এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে নিয়ে যেতে পারে। কী কী কারণে 'স্থানান্তর', তা জানিয়ে মন্ত্রীর বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রশাসনিক থেকে কাজের সুবিধা-অসুবিধার জন্য অনেক ঠিকানা বদল হয়েছে। এছাড়াও যোগাযোগ ব্যবস্থা, পরিচালন খরচ এবং পরিচালনার সুবিধার মতো কারণও দেখিয়েছে অনেক সংস্থা।

মুখ্যমন্ত্রী আপনি বলতে পারেন, এই রাজ্যে সরকারি খরচে ঢাকঢোল পিটিয়ে গ্লোবাল বিজনেস সামিট হয়। কিন্তু কোনও সংস্থা টিকে থাকে না। এটা আমরা অনেক দিন ধরেই দেখছি। এবার কেন্দ্রের রিপোর্টে সেটা সত্য বলে জানা গেল। এত বেসরকারি সংস্থা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রাজ্যে বেকারত্ব বাড়ছে এবং নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে না। গোটা দেশেই যখন উন্নয়নের জোয়ার, নতুন নতুন বিনিয়োগ আসছে, তখন পশ্চিমবঙ্গে কাজের পরিবেশ না থাকায় একের পর এক সংস্থা রাজ্য ছেড়ে চলে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে যে শিল্পের পরিবেশ নেই, সে কথাটি নতুন করে বলার প্রয়োজন ছিল না। রাজ্যবাসী কথাটি হাড়ে-হাড়ে জানেন। আপনার তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে সর্বগ্রাসী দুর্নীতি সেই শিল্পহীনতাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। কিন্তু রাজ্য থেকে শিল্পসংস্থার বিদায় বা তাদের সদর দপ্তর অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায় তো আপনাকেই নিতে হবে। এ অবস্থা বাম আমল থেকেই। শ্রমিক অশান্তি এবং তার সম্পূর্ণ ফয়দা তোলে দায়িত্বজ্ঞানহীন বামপন্থী রাজনীতি। পুরনো সংবাদপত্রের পাতা উলটালে জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়ন রাজনীতির যে সব নিদর্শন মিলবে, তা কোনও সভ্য দেশে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। পুঁজির হস্তান্তরের কারণে শিল্পক্ষেত্রে তৈরি হওয়া অস্থিরতার সমাধানসূত্র বের করার পরিবর্তে সেই শ্রমিক আন্দোলন শিল্পমেধ যজ্ঞে নামে। তাতে রাজনৈতিক লাভ হয়েছিল বিলক্ষণ, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ শিল্পশ্মশানে পরিণত হয়। অন্যদিকে ছিল দিল্লির নেহরু সরকার। রেলের মাশুল সমীকরণ নীতির ফলে প্রাকৃতিক সম্পদে ঋদ্ধ পূর্ব ভারত তার সুবিধা হারায়। পশ্চিমবঙ্গের অর্থব্যবস্থায় তার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। কিন্তু শুধুমাত্র এটুকুই নয়, তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার তার শিল্প ও বাণিজ্য পরিকল্পনাকে ক্রমেই দিল্লি ও উত্তর-পশ্চিম ভারতমুখী করে তোলে। তার ফলে বিধ্বস্ত পশ্চিমবঙ্গ থেকে কর্পোরেট পুঁজির নিষ্ক্রমণ ঘটতে থাকে।

তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে সর্বগ্রাসী দুর্নীতি শিল্পহীনতাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। রাজ্য থেকে শিল্পসংস্থার বিদায় বা তাদের সদর দপ্তর অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায় তো আপনাকেই নিতে হবে।

তবে শুধুমাত্র অতীত নয়, বর্তমানেও সেই একই ঘটনা ঘটে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ তবে কী হবে? কিন্তু আমার অন্য একটা প্রশ্নও রয়েছে। আপনি যে বিদেশ থেকে অনেক খরচ করে শিল্প আনতে যান, বড়ো বড়ো কথা বলেন, সেগুলোর কী হলো? আপনি তো আবার চপশিল্পে ভরসা রাখতে চান। কিন্তু এবার তো পশ্চিমবঙ্গের কথা ভেবে সে সব বন্ধ রেখে কাজের কাজ করতে হবে! □

অতিথি কলম

স্বপন দাশগুপ্ত

সরাসরি হস্তক্ষেপ না করলেও বাংলাদেশ প্রশ্নে আমেরিকাকে চাপ দিতে পারে ভারত

আর কিছু না হলেও, দেশদ্রোহের অভিযোগে প্রতিবাদী হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাস প্রভুর গ্রেপ্তারের বিষয়টি বর্তমান বাংলাদেশ প্রশাসন সম্পর্কে সবার চোখ খুলে দিয়েছে। এক-একটি দিন অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে মুছে যাচ্ছে একাধিক অস্পষ্টতা। গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার সরকারকে উৎখাতের পর যে শাসনব্যবস্থা বাংলাদেশে বলবৎ হয়েছে, প্রতিদিন স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে চলেছে তাদের চরিত্র।

প্রথমত, এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে ক্ষমতার কেন্দ্রটি বর্তমানে স্থানান্তরিত হয়েছে। এই ক্ষমতা চলে গিয়েছে ইসলামি কট্টরপন্থীদের হাতে। বাংলাদেশের ক্ষমতার কেন্দ্রস্থলে এখন রয়েছে এই জেহাদিরা। মাস কয়েক আগে হাসিনা-বিরোধী বিক্ষোভের সামনের সারিতে থাকা ছাত্রদের পিছনে ছিল তাদেরই সমর্থন। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা, নোবেলজয়ী মহম্মদ ইউনুস হয়তো সেই দেশের নেতৃত্বে রয়েছেন, কিন্তু তিনি নামমাত্র ক্ষমতার অধিকারী। গত চার মাসের ঘটনাপ্রবাহ প্রমাণ করছে যে তিনি ও তার এই এনজিও-র নমিনিরা (অর্থাৎ, তার প্রশাসনে বসে থাকা মনোনীত প্রশাসকরা) কিছু লোকের দয়ায় গদিতে টিকে রয়েছেন। পাকিস্তানের শাসন হতে মুক্ত হয়ে ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসকে যারা উলটে দিতে চায়, ধ্বংস করতে চায় মুক্তিযুদ্ধের উত্তরাধিকার, তাদের করুণায় ইউনুস এবং তার মনোনীত ব্যক্তিরা— দু'দলই নেতৃত্বে বিদ্যমান। দু'মাস আগে 'ভয়েস অফ আমেরিকা'কে একটি সাক্ষাৎকার দেন ইউনুস। তার দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইউনুস 'রিসেট'-এর উল্লেখ করে। রিসেট অর্থাৎ প্রশাসনিক সংস্কার। দুর্নীতি-বিধ্বস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির খোলনলচে পাল্টে প্রতিষ্ঠানগুলির মান-মর্যাদা পুনরুদ্ধারের বিষয়টি হয়তো বলতে চেয়েছে ইউনুস, কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলির হৃতগৌরব উদ্ধারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, আছে ও থাকবে তার দেওয়া এই প্রতিশ্রুতি। কারণ তার প্রশাসনকে সমর্থনকারী গোষ্ঠীগুলির স্পষ্টতই অন্য ধারণা ও পরিকল্পনা রয়েছে। ঘটনা পরম্পরা যেদিকে চলেছে, তা যদি সেইভাবেই চলা অব্যাহত থাকে, তবে বাংলাদেশ হয়তো অচিরেই একটি চরম মোল্লাবাদী, ইসলামি কেল্লায় পর্যবসিত হবে। বাংলাদেশ পুরোপুরিভাবে একটি জেহাদি-শাসিত দেশে পরিণত হলে পূর্ব ভারতের জন্য তা হবে একটি অশুভ সংকেত।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ জুড়ে ইসলামপন্থীদের রাজনৈতিক প্রভাব ক্রমবর্ধমান। তাদের এই প্রভাব বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশের হিন্দু সংখ্যালঘুদের অবস্থা হয়ে উঠেছে আরও দুর্বিষহ! বাংলাদেশের হিন্দুরা সাধারণত আওয়ামি লিগকে সমর্থন করে থাকেন। আওয়ামি লিগের সমর্থক হওয়ার দরুন গত ৫ আগস্টের পর তাদের উপর নেমে আসে ভয়াবহ রাজনৈতিক সন্ত্রাস। নিদারুণ নির্যাতনের শিকার হন তারা সবাই। হিন্দুদের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে খতম করার পিছনে উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে এখনও বিদ্যমান ১.৩ কোটি হিন্দুর মধ্যে চূড়ান্ত নিরাপত্তাহীনতা তৈরি করা। হিন্দুদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে এই রাজনৈতিক নেতৃত্ব নিধন পর্ব ছিল একটি সুকৌশলী পদক্ষেপ।

বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের দ্বারা প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী গত ৪ থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত ২০১০টি সংখ্যালঘুদের উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। তারপরে গত ২২ আগস্ট থেকে ১২ অক্টোবরের মধ্যে সংখ্যালঘুদের উপর আরও ৫৭টি আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে পরিষদ। হিংসা ও সন্ত্রাসের প্রথম পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ১৭০৫টি পরিবার, আক্রান্ত হন প্রায় ৫০ হাজার মানুষ। এর সঙ্গে ৬৯টি উপাসনালয়ে (যার মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু মন্দির) আক্রমণ, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। বাংলাদেশে এ বছরের দুর্গাপূজায় লাউড স্পিকার ব্যবহারের উপরেও নিষাধাজ্ঞা জারি করা হয়। চূড়ান্ত ভয় ও আতঙ্কের পরিবেশের মধ্যে বাংলাদেশে এবারের দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

তৃতীয়ত, অতীতে বাংলাদেশ জুড়ে হিন্দু নিপীড়ন শুরু হলে, বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত হতে শুরু হতো হিন্দু পলায়ন। উদ্বাস্তু, ছিন্নমূল হিন্দুরা প্রাণ বাঁচাতে বৈধ বা অবৈধ— যে কোনো উপায়ে ভারতে প্রবেশ করতে মরিয়া হয়ে উঠতেন। স্বাধীনতার সময়ে হয় দেশ বিভাজন। ভারত বিভাজনের পর তৈরি হওয়া পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল প্রায় ২৮ শতাংশ। এরপর ৭৫ বছর ধরে কমতে কমতে ২০২২ সালে হিন্দু জনসংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ৮ শতাংশের কম। একটি আধা-ইসলামি দেশে বসবাসের ক্ষেত্রে শোচনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় হিন্দুরা। সেই দেশে হিন্দুদের সম্পত্তি, অর্থ, জীবন— কোনো কিছুই সুরক্ষিত ছিল না। পূর্ব পাকিস্তান থেকে শুরু হয় হিন্দু-এক্সোডাস। দেশত্যাগের জন্য নিরাপত্তাহীনতা ছিল অনেকাংশে দায়ী। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হিন্দু সাংস্কৃতিক প্রভাব হতে বাংলাদেশকে মুক্ত করার জন্য ১৯৪৭ সাল থেকে মুসলমানদের তরফে পরিকল্পনামাফিক সন্ত্রাস। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে চালায় নৃশংস দমন পীড়ন। সেই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ভারতের সীমান্ত জুড়ে নামে হিন্দু শরণার্থীদের ঢল। ভারতের উদ্দেশে পাড়ি দেওয়া শরণার্থীদের অধিকাংশই স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে যাননি।

এই বছর বাংলাদেশ জুড়ে শুরু হয়েছে ভয়াবহ হিন্দু নির্যাতন। অন্যান্য বার নিপীড়নের সম্মুখীন হিন্দুসমাজ বাংলাদেশ ছেড়ে পালাতে তৎপর হয়ে উঠত। এ বছর নিপীড়ন ভয়াবহ আকার ধারণ করলেও, সেই নিপীড়নের প্রেক্ষিতে হিন্দুদের মানসিকতা ও কার্যকলাপে এবারে একটি স্পষ্ট পরিবর্তন চোখে পড়ছে। সৌজন্যে ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাস প্রভু। তিনি এবং তাঁর মতো অন্যান্য হিন্দু সন্ন্যাসীদের

ধন্যবাদ ও প্রণাম। তাঁদের নেতৃত্বদানের জন্যই ঢাকা ও চট্টগ্রামে হিন্দুদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে বিশাল প্রতিবাদ। বিক্ষোভ সমাবেশগুলিতে ব্যাপকভাবে শামিল হয়েছেন নির্যাতিত হিন্দুরা। অত্যাচারের মুখে দাঁড়িয়ে ভারতে পালানোর পরিবর্তে হিন্দু নেতৃত্ব এইবার বাংলাদেশের হিন্দুসমাজকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বার্তা দিয়েছেন। বাংলাদেশে বসবাসকারী হিন্দুদের নিজস্ব দেশ হলো বাংলাদেশ। সেই দেশের বুকে দাঁড়িয়ে হিন্দু নেতৃত্ব বার্তা দেন যে হিন্দুরা তাঁদের দেশ ছেড়ে কোথাও যাবে না। সেই দেশে থেকেই তাঁরা তাঁদের অধিকার রক্ষার লড়াই জারি রাখবে। এই প্রতিবাদ-বিক্ষোভের কারণে হিন্দুদের উপর পুনরায় শুরু হয়েছে বীভৎস নির্যাতন। বাংলাদেশকে ফের পূর্ব পাকিস্তানে পরিণত করার খেলায় যারা মত্ত, তারাই গত আগস্টে বাংলাদেশে ঘটিয়েছে জেহাদি অভ্যুত্থান। পাকিস্তান সৃষ্টির আসল পরিকল্পনাটিকে এইবার পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়িত করে হিন্দুশূন্য পূর্ব পাকিস্তান তৈরির কাজে লিপ্ত জেহাদিরা হিন্দুদের উপর নামিয়ে আনছে ভয়াবহ আক্রমণ।

সবশেষে বাংলাদেশের ক্ষমতাকেন্দ্রে সংঘটিত পরিবর্তন এবং বাংলাদেশ জুড়ে ঘটে চলা হিন্দু নির্যাতনের প্রেক্ষিতে নয়াদিল্লির প্রতিক্রিয়া ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম। নয়াদিল্লির এবারের এই ভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি কিন্তু বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর সরাসরি আঘাত নেমে এলেও সেই ঘটনাগুলি প্রতিবেশী দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়।'— অতীতে বাংলাদেশ সম্পর্কে এটাই ছিল নয়াদিল্লির দৃষ্টিকোণ। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন ভারত সরকার বাংলাদেশ সম্পর্কে ভিন্নরকম অবস্থান গ্রহণ করেছে। বিগত সরকারগুলির নেওয়া অবস্থানের বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে বর্তমান ভারত সরকারের তরফে হয়েছে অবস্থান পরিবর্তন। বর্তমান সরকারের নেওয়া অবস্থানে স্পষ্ট হয়েছে যে বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর নির্যাতন ও নিপীড়ন ভারতের কাছেও একটি অন্যতম প্রাসঙ্গিক ও বিবেচনাযোগ্য বিষয়। একই সঙ্গে বাংলাদেশ থেকে সীমান্তবর্তী তিনটি রাজ্য— পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও ত্রিপুরা অভিমুখে হিন্দু-এক্সোডাস (অর্থাৎ, এই রাজ্যগুলিতে বাংলাদেশ থেকে আগত হিন্দু শরণার্থীদের ঢল নামা) ঠেকাতে ভারত তার সীমান্ত প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে এবং কঠোর অভিবাসন নীতি গ্রহণ করে ভিসা দান ব্যবস্থার পরিবর্তন করেছে। বার্তাটি স্পষ্ট। ভারত চায় বাংলাদেশের হিন্দুরা তাদের অধিকার রক্ষার লড়াই বাংলাদেশের বুকে দাঁড়িয়েই করুক।

ভারতের সামনে এই মুহূর্তে কোনো সহজ বিকল্প নেই। বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ আন্তর্জাতিকস্তরে কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হবে না। আন্তর্জাতিক মহলে সেই পদক্ষেপ অগ্রহণীয় হওয়া ছাড়াও সেহেন পদক্ষেপে ইউনুস নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশি শাসকগোষ্ঠী পরোক্ষে পাবে নানা সুবিধা। এই ধরনের পদক্ষেপে, বাংলাদেশে হস্তক্ষেপকারী শক্তির অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে ইউনুস প্রশাসনেরই লাভ। বাংলাদেশের উত্তপ্ত, গৃহযুদ্ধপ্রায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বিপ্রতীপে একটি কার্যকর বিকল্প হলো আরও কিছুটা ধৈর্য ধরা এবং বাংলাদেশ যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের মুখোমুখি হয়েছে— তাকে আরও ঘনিয়ে উঠতে দেওয়া।

এর পাশাপাশি, আমেরিকায় ট্রাম্প প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণের পরে সেই প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টির প্রয়োজন। গণতন্ত্র পুনঃস্থাপনের অন্তরালে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট এবং তাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলির তরফে বাংলাদেশে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির বীজ বপন করা হয়েছে, সেই বিষবৃক্ষ আজ মহীরূহে পরিণত। তাদের সৃষ্ট এই বিষবৃক্ষকে উপড়ে ফেলার জন্য তাদের উপরেই তৈরি করতে হবে চাপ। ভারতের কাছেও এটা পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন যে দেশের পূর্ব সীমান্ত লাগোয়া একটি বৈরীমনোভাবাপন্ন দেশে জেহাদিদের দ্বারা পরিচালিত প্রশাসন ভারতের পক্ষে পদে পদে সৃষ্টি করবে নানা প্রতিকূলতা। কীভাবে, কোন পদ্ধতিতে এই বিষবৃক্ষচ্ছেদন অভিযান চলা উচিত তা যদিও জনসমক্ষে বিতর্কের বিষয় নয়।

(লেখক রাজ্যসভার সদস্য)

বিজ্ঞপ্তি

শিলিগুড়িতে লক্ষকণ্ঠে গীতাপাঠ

আগামী ১৫ ডিসেম্বর শিলিগুড়ি কাওয়াখালি ময়দানে সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত সনাতন সংস্কৃতি পরিষদের পরিচালনায় লক্ষকণ্ঠে গীতাপাঠের আয়োজন করা হয়েছে। এই বিরাট অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন স্বামী জ্ঞানানন্দজী মহারাজ, যিনি কুরুক্ষেত্রে ১৬ লক্ষ ভক্তের উপস্থিতিতে গীতাজয়ন্তী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। এই সভায় সারা ভারত থেকে এক হাজার সাধুসন্ত ছাড়াও অখণ্ড মহামণ্ডলেশ্বরগণও উপস্থিত থেকে আশীর্বাদ করবেন। বাংলাদেশ, ভুটান থেকেও ভক্তরা অংশগ্রহণ করবেন।

।। সকলের সাদর আমন্ত্রণ ।।

শোক সংবাদ

উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কার্যকারিণীর সদস্য তথা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট নগরের বিবেকানন্দ প্রভাত শাখার স্বয়ংসেবক উদয়শঙ্কর সরকার গত ৭ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৭ বছর। তিনি তাঁর মা, স্ত্রী, ২ ভাই এবং ১ কন্যা রেখে গেছেন। ১৯৯৬ সালে তিনি স্বয়ংসেবক হন। তারপর নগর কার্যবাহ, জেলা কার্যবাহ, বিভাগ কার্যবাহ, প্রান্ত সহ বৌদ্ধিক প্রমুখের দায়িত্ব পালন করেছেন।

* * *

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ খণ্ডের বেথুয়াবাটি শাখার কার্যবাহ পবিত্র সাউয়ের পিতামহ অনিল সাউ গত ৫ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। তিনি ১ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

কলকাতা দক্ষিণেশ্বর শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক হরিপাল যাদব গত ২১ নভেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। তিনি পূর্বরেল কর্মচারী সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন এবং সংগঠন সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর একমাত্র পুত্র অরিজিৎ যাদব দক্ষিণেশ্বর নগর কার্যবাহের দায়িত্ব পালন করছেন।

সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকে প্রাধান্য দিয়েই দেশের সংবিধান চলবে, স্পষ্ট মত বিচারপতির

ভারতীয় সংবিধানে সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার কথা অবশ্যই আছে, কিন্তু তা কখনোই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আত্মত্যাগের বিনিময়ে নয়। এমনটাই মনে করেন এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি শেখর কুমার যাদব। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, 'হিন্দুস্থান সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ইচ্ছা অনুযায়ীই চলবে।' হিন্দুত্বের প্রসঙ্গ এলেই তার বিপরীতে বিশেষ করে বামপন্থীরা যুক্তি দেখান যে, সংখ্যালঘুদের অধিকার মেনে নেওয়াই সংখ্যাগরিষ্ঠের মানবতার পরিচয়।

'এক দেশ এক আইন' নিয়ে প্রয়াগরাজে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এক আলোচনা সভায় বিচারপতি শেখর কুমার যাদবের এহেন মন্তব্য দেশের সংবিধানকে গতানুগতিকতার বাইরে বেরিয়ে নতুন পথ দেখাবে বলেই মনে করছেন তথ্যাভিজ্ঞ মহল।

বিচারপতি যাদব আরও বলেন যে, 'আইন আসলে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে কাজ করে। এটাকে পরিবার বা সমাজের প্রেক্ষাপটে দেখুন...। সংখ্যাগরিষ্ঠের কল্যাণ ও সুখের জন্য কী সুবিধা হবে, সেটাই মানা হবে।' তাঁর বক্তব্যকে উদ্ধৃত করেছে লাইভ-ল। যদিও সংবাদমাধ্যমের একাংশ বিচারপতি যাদবের মন্তব্য নিয়ে জলঘোলা করতে চাইলেও বা 'একান্ত ব্যক্তিগত' আখ্যা দিতে চাইলেও ভারতীয় আইনবিভাগ যে বিচারপতি যাদবের বক্তব্যই অনুমোদন করে তা বোঝা যায় আলোচনা সভায় উপস্থিত এলাহাবাদ হাইকোর্টের অপর বিচারপতি দীনেশ পাঠকের কথায়। তিনিও স্পষ্টই বলেন, মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু স্ত্রী, তিন তালাক ও হালালের মতো যে প্রথাগুলি এখনো রয়েছে তা দেশের আইনের চোখে 'গ্রহণযোগ্য নয়।'

বিচারপতি পাঠকের বক্তব্যের সূত্র ধরে এপ্রসঙ্গে বিচারপতি যাদবের প্রতিক্রিয়া, 'আপনি যদি বলেন যে আমাদের ব্যক্তিগত আইন এটির অনুমতি দেয় তবে তা মানতে আমরা বাধ্য নই। কারণ একজন মহিলাকে অসম্মান করার অধিকার কারোর নেই, যাঁকে আমাদের শাস্ত্র এবং বেদে দেবী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। একইভাবে কেউ চারটি স্ত্রী রাখার অধিকার দাবি করতে পারেন না। কেউ যদি বলেন যে হালাল বা তিন তালাক মানবো কিংবা নারীদের ভরণপোষণ দেব না। কিন্তু তা বরদাস্ত করতে ভারতীয় সংবিধান রাজি নয়।'

বিচারপতি যাদবের আরও বক্তব্য যে, হিন্দুধর্মেও এককালে বাল্যবিবাহ, সতী হওয়ার মতো বেশ কিছু অস্বস্তিকর বিষয় ছিল, কিন্তু রাজা রামমোহন রায়ের মতো মানুষ এইসব প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করে তা দূর করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য হলো, ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ একই সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অনুসরণ করবে বলে আশা করে না হিন্দুরা, তবে অন্য ধর্মের মানুষরা 'অবশ্যই এই দেশের সংস্কৃতি, মহান ব্যক্তিত্ব ও দেবতাদের অসম্মান করবে না বলে আশা করাই যায়'।

> "ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ একই সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অনুসরণ করবে বলে আশা করে না হিন্দুরা, তবে অন্য ধর্মের মানুষরা 'অবশ্যই এই দেশের সংস্কৃতি, মহান ব্যক্তিত্ব ও দেবতাদের অসম্মান করবে না বলে আশা করাই যায়'।"

বিচারপতির প্রশ্ন, 'আমাদের দেশে শেখানো হয় যে ক্ষুদ্রতম প্রাণীরও যাতে ক্ষতি না হয়, পিঁপড়েকেও না মারতে বলা হয়। এই শিক্ষা আমাদের মনে গেঁথে আছে। সম্ভবত সে কারণেই আমরা সহনশীল ও সহানুভূতিশীল। অন্যরা কষ্ট পেলে আমরা ব্যথা পাই। কিন্তু ভিনদেশি সংস্কৃতিতে যদি ছোটোবেলা থেকেই শিশুরা পশু জবাই করতে শেখে এবং তা আমাদের দেশের সংস্কৃতির ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় তবে আমরা কীভাবে তারা সহনশীল এবং সহানুভূতিশীল হবে বলে আশা করতে পারি?'

দেশব্যাপী 'এক দেশ এক আইন' নিয়ে জোর সওয়াল করে বিচারপতি যাদব জানান, যে অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণে সময় লেগেছে, কিন্তু 'সেই দিন দূরে নয় যখন এটি পরিষ্কার হবে যে একটি দেশ থাকলে, একটি আইন এবং একটি শাস্তিমূলক আইনও থাকা উচিত।' তাঁর হুঁশিয়ারি: 'যারা নিজস্ব অ্যাজেন্ডা চালানোর চেষ্টা করে, তারা বেশিদিন টিঁকবে না।'

প্রসঙ্গত, বিচারপতি শেখর কুমার যাদব এর আগেও জাতীয়তাবোধের আঙ্গিক থেকে ভারতীয় সংবিধানকে ব্যাখ্যা করেছেন। সেইসূত্রে তিনি গোজাতিকে 'জাতীয় পশু' করার এবং গোরুর সুরক্ষাকে 'হিন্দুদের মৌলিক অধিকার' হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। উত্তরপ্রদেশে গোহত্যা আইনের অধীনে গোরু চুরি ও পাচারের অপরাধে অভিযুক্ত এক ব্যক্তির জামিনের আবেদন নাকচ করায় এই মন্তব্য করেছিলেন তিনি।

চিন্ময় প্রভুর গ্রেপ্তারের পরও কি ভারত সরকার চুপ করে বসে থাকতে পারে?

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

প্রশ্নটা করেছিল আমার এক বামপন্থী বন্ধু। তার বক্তব্য ছিল বাংলাদেশে গত চার মাস ধরে ঘটে চলা হিন্দুদের ওপর অত্যাচার এবং তার প্রতিবাদে গড়ে ওঠা স্বতঃস্ফূর্ত হিন্দু আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময় প্রভুর গ্রেপ্তারের ঘটনায় ভারত সরকার কোনো কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না কেন? তার প্রশ্ন শুনে আমি তো অবাক! একি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে? তাকে উলটে প্রশ্ন করেছিলাম মোদী করেনি সেটা অবশ্যই তার দোষ, কিন্তু তোমরা বামপন্থীরা, এর বিরুদ্ধে কী করেছ? কলকাতা প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই দাবি তুলেছ? তোমাদের বামপন্থী নেতাদের সিংহভাগই তো হিন্দু। শুধু হিন্দু নয়, বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে আসা হিন্দু। তোমাদের কাকা-মামা, মাসি-পিসি অনেকেই তো আজও বাংলাদেশে রয়েছেন। তাদের এই বিপদে তোমরা তো একটা বিবৃতি দিয়ে বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে পারতে? তোমাদের বিকাশ, সুজন, শতরূপ, মীনাক্ষী, দীপ্সিতারা তো এর বিরুদ্ধে 'ইনসাফ যাত্রা' বা ধিক্কার মিছিল বার করতে পারতো। করেছো কি? তা না করে কেবল ভারত সরকার দায়িত্ব পালন কেন করছে না সেই নিয়ে বিশেষজ্ঞের মতামত দিচ্ছ।

উত্তর শুনে বন্ধুটি বলে দেখো ভাই, আমরাও মনেপ্রাণে বাংলাদেশের হিন্দুদের পাশে দাঁড়াতে চাই। কিন্তু সংখ্যালঘু ভোটব্যাংক বড়ো বালাই। মুসলমান ভোট ফিরে পাওয়ার যে আশা নিয়ে আমরা মহম্মদ সেলিমকে রাজ্য সম্পাদক করেছি, তার হাতে দলীয় রাজ্যপাট তুলে দিয়েছি, বাংলাদেশের হিন্দুদের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে যদি সেই ভোটব্যাংক ক্ষেপে যায়, তবে আমরা কোনোদিনই আর ক্ষমতায় ফিরতে পারবো না। তাই মনে ইচ্ছা থাকলেও প্রকাশ্যে এর প্রতিবাদ করতে পারছি না। এতক্ষণে পরিষ্কার হলো বামপন্থীদের 'শেয়ালি বুদ্ধি'। এজন্যই তারা বাংলাদেশে হিন্দু অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদে নামেনি, বরং সব দায়িত্ব মোদীর ঘাড়ে ফেলে দায় সারতে চায়। শুধু আমার ওই বন্ধুটি নয়, হাটে-বাজারে, পাড়ায়, ময়দানে বামপন্থী বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলুন, সকলেরই প্রায় একই মত, তাদের বক্তব্য ভারত সরকার কেন কিছুই করছে না।

ভারত সরকারের কথা ছাড়ুন, চিন্ময় প্রভুর গ্রেপ্তারির পর আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলি যারা হিন্দুদের ভোটে বেঁচেবর্তে আছে তাদের কি এই বিষয়ে কোনো বক্তব্য আছে? এদেশে হাজার হাজার সামাজিক সংগঠন, এত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, তাদের কি কোনো কর্তব্য নেই? আজও ভারতের জনসংখ্যার আশি শতাংশ হিন্দু। এদেশের সামাজিক সংগঠনগুলির ৯৯ শতাংশই চলে হিন্দুদের আর্থিক আনুকূল্যে। তবে এরা বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর ঘটে চলা এই ঘটনায় নিশ্চুপ কেন? কোটি টাকার দুর্গাপূজা করা ক্লাব, কোটি টাকার জগদ্ধাত্রীপূজা করা কমিটিগুলি কোথায়? আজ যখন পাশের ঘরের জ্যান্ত দুর্গারা আক্রান্ত, আজ যখন আমাদের রক্তের সম্পর্কের নিকটাত্মীয়রা, রক্তমাংসের জগদ্ধাত্রীরা আগুনে পুড়ে মরছে, তখন এই বিরাট বিরাট পূজা কমিটিগুলি কোথায়? ওদেশে যখন রবীন্দ্রনাথের মূর্তিগুলি ভেঙে খান খান করে ফেলা হচ্ছে, তখন পাড়ায় পাড়ায় রবীন্দ্রজয়ন্তীতে সারারাত জাগিয়ে থাকা ক্লাবগুলি কোথায়? সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু, নোবেল স্মারক পুরস্কারপ্রাপ্ত অমর্ত্য, সংগীতকার নচিকেতা, ফিল্মস্টার পরমব্রত সকলেই তো ওপারের বাঙ্গালি, কিন্তু বাঙ্গালির এই দুঃসময়ে তারা কেন মূক ও বধির? এরা সামান্য প্রতিবাদটুকু জানাতে পারে না, কিন্তু ভারত সরকার কেন করছে না তার হিসাব নিতে বসেছেন? তাদের মনে করিয়ে দেওয়া উচিত— দেহ থেকে প্রাণ ত্যাগ করাকেই কেবল মৃত্যু বলে না। নিজের ধর্ম সংস্কৃতির উপর আঘাত হচ্ছে দেখেও চুপ করে থাকাটাও এক প্রকার মৃত্যু। আপনারা প্যালেস্টাইন, ইরাক, সিরিয়া, লেবানন নিয়ে গলা ফাটাতে পারেন, কিন্তু পাশের বাড়ি বাংলাদেশের হিন্দুদের পাশে দাঁড়াতে পারেন না। কারণ এখানে নির্যাতিতরা সকলেই হিন্দু। ধিক্ আপনাদের, ধিক্।

এখনোও যদি ওখানে বাস করা ৮ শতাংশ হিন্দুর ওপর অত্যাচার হয় তবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে পালিয়ে আসা ২২ শতাংশ হিন্দুর জমি বাংলাদেশ থেকে কেড়ে নিয়ে হয় ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হোক, নতুবা প্রয়োজনে ওদেশের হিন্দুদের জন্য নতুন হোমল্যান্ড তৈরি করা হোক।

কী অপরাধ করেছিলেন চিন্ময় দাস প্রভু? কী বলেছিলেন তিনি যার জন্য তাকে দেশদ্রোহিতা ও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার অপরাধে কারাগারে পুরে রেখেছে ইউনুস সরকার? সে দেশের সুপ্রিম কোর্ট তার বিচার করছে? দোষ কী তাঁর? তিনি শুধু বলেছিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন যারা দুর্বলতা লালন করে তারা সাধু হতে পারে না। যারা সাধু নয় তারা

আর্যপুত্র হতে পারে না। তারা বেদের অনুগামী হতে পারে না। যারা বেদের অনুগামী, যারা সনাতনী, তারা সর্বদাই সাহসী। কারণ তাদের মৃত্যু নেই। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন— আত্মাকে ছেদন করা যায় না, পোড়ানো যায় না, শুকানো যায় না, তাকে জলে ডোবানো যায় না— সেই অবিনাশী আত্মাই আমার স্বরূপ। প্রতিটি সনাতনী অমৃতের সন্তান। শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা'। অনেকে তো একবার মরে, আর আমরাই শুধু বারবার জন্মগ্রহণ করি। আমাদের মৃত্যু হয় না। সুতরাং যাদের মৃত্যু নেই তারা কেন ভীত হবে? যারা ভীত হবে তারা অমৃতের পুত্র নয়। যারা ভীতু, যারা কাপুরুষ, তারা বঙ্গজননী সুদেষ্ণার পুত্র হতে পারে না। এই বঙ্গভূমি বলি মহারাজের পত্নী সুদেষ্ণার পাঁচ পুত্রের অন্যতম তৃতীয় পুত্র বঙ্গের নামানুসারে এই বঙ্গ। আমরা এই ভূমির ভূমিপুত্র, আমরা উড়ে আসিনি। আমরা মুঘল নই, আমরা ব্রিটিশ নই, আমরা ওলন্দাজ নই, আমরা পর্তুগিজ নই— আমরা এই ভূমির সন্তান। আমাদের উৎখাত করার চিন্তা করো না।" —বলুন তো এই বক্তব্য রাখা কি দেশদ্রোহিতা? এই ভাষণ কি ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা? এর জন্য জেলে যেতে হবে চিন্ময় প্রভুকে? আসলে মোটেই তা নয়। ভারতের এক যোগী যেমন হিন্দুদের ডাক দিয়ে বলেছেন, 'বাঁটোগে তো কাটোগে', ঠিক তেমনই চিন্ময় প্রভু বাংলাদেশের হিন্দুদের বলেছেন সকলে এক হও, সুখে-দুঃখে, আনন্দে- নিরানন্দে এক হয়ে থাকো। তবেই সকলে বাঁচবে। এই কথা সহ্য হয়নি জেহাদিদের। তাই তাকে জেলে ভরে এর প্রতিশোধ নিচ্ছে।

ভারতের চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ পেলে যে বাংলাদেশের উনুনে হাঁড়ি চড়ে, কলকাতার বাইপাসের হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসা না করালে যে বাংলাদেশি মোল্লা মৌলবিদের প্রাণ বাঁচে না, যে ভারতের তুলো-পশম-কাপড় ছাড়া বাংলাদেশিদের লজ্জা নিবারণ হয় না— সেই দেশের অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসনের প্রধান উপদেষ্টা বালখিল্য ইউনুসের এত সাহস যে 'বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজির' ছাত্ররা তাদের ইউনিভার্সিটির গেটের পা-দানিতে ভারতের জাতীয় পতাকা রেখে তার উপর দিয়ে হেঁটে কলেজে ঢোকে? এবার সময় হয়েছে, ভারত সরকার জাগুক। এই উদ্ধত জেহাদিদের বুঝিয়ে দিক যে, ওপারের হিন্দুরা আমাদের থেকে আলাদা নয়, তারা আমাদের আত্মীয়। ওদের গায়ে হাত দিলে তোমাদেরও ছাড়া হবে না। ভারতের জনগণের করের টাকায় আমাদের এত মিসাইল, যুদ্ধবিমান, যুদ্ধজাহাজ, বিপুল অস্ত্রভাণ্ডার, সেগুলো বাচ্চাদের খেলার জন্য তৈরি করা হয়নি। স্বজাতির জীবন, মা-বোনেদের সম্মান ও ভারতের মানসম্মান রক্ষার জন্য জমা করা হয়েছে। যারা পাকিস্তানের হায়নাদের থেকে মুক্ত করে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন দেশের জন্ম দিতে পারে, তারা দরকারে বাংলাদেশের মধ্যেও হিন্দুর জন্য আর একটি নতুন হোমল্যান্ড তৈরি করতে পারে।

নেহরু-লিয়াকত চুক্তির পর নিজের নিজের দেশের সংখ্যালঘুদের রক্ষা করার যে দায়িত্ব নিয়েছিল ভারত-পাকিস্তান দুই দেশ। ভারত এই চুক্তি মেনে চললেও পাকিস্তান কোনোদিনই এই চুক্তিকে মানেনি। বাংলাদেশ যদি তাদের দেশের সংখ্যালঘুদের রক্ষার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হয় তবে ভারতের উচিত বাংলাদেশকে সেই দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া। ১৯৪৭ সালে যে পূর্ববঙ্গে ৩০ শতাংশ হিন্দু ছিল, আজ তা কমে ৮ শতাংশেরও কম। সেই ২২ শতাংশ হিন্দু কোথায় গেল? তারা ধর্ম বাঁচাতে, প্রাণ বাঁচাতে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। এখনোও যদি ওখানে বাস করা ৮ শতাংশ হিন্দুর ওপর অত্যাচার হয় তবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে পালিয়ে আসা ২২ শতাংশ হিন্দুর জমি বাংলাদেশ থেকে কেড়ে নিয়ে হয় ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হোক, নতুবা প্রয়োজনে ওদেশের হিন্দুদের জন্য নতুন হোমল্যান্ড তৈরি করা হোক— এই সরল গণিতটা এস জয়শঙ্কর হোক কিংবা অজিত দোভাল ইউনুসদের একটু ভালো করে বুঝিয়ে দিক, দেখবেন তারপরেই এরা কেমন ঠাণ্ডা মেরে যাবে।

চিন্ময় প্রভুর মুক্তি এবং হিন্দু নির্যাতনের বিরুদ্ধে এদেশের হিন্দু সংগঠনগুলির যেমন দায়িত্ব রয়েছে, সেরকম ভারত সরকারও তার দায় এড়াতে পারে না। বাংলাদেশে পড়ে থাকা হিন্দুরাও সাতাত্তর বছর আগে ভারতীয় ছিলেন। তাঁরাও বন্দেমাতরম্ বলতেন। বস্তুত স্বদেশী আন্দোলনে সবচেয়ে বেশি রক্ত ঝরিয়েছিল ওপারের বিপ্লবীরাই। মাস্টারদা সূর্যসেন, প্রীতিলতা, বিনয়, বাদল, দীনেশের জন্মভূমি কর্মভূমি ঢাকা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, রংপুর। আজ আমরা নিজেদের স্বাধীন বলে যে গর্ববোধ করি তার জন্য পূর্ববঙ্গের অবদান সবচেয়ে বেশি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যই তাঁরা প্রাণ দিয়েছিলেন। তবে আজ তাদের উত্তরপুরুষরা, তাদের সন্তান সন্ততিরা, যখন একদল মরুদস্যুর হাতে চরম লাঞ্ছিত অত্যাচারিত, তখন ভারত সরকার কি চুপ করে বসে থাকতে পারে?

পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল এই ইস্যুতে 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' চালাকির আশ্রয় নিয়েছে। মুসলমান ভোটের কথা ভেবে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের কথা তারা মুখেই আনছে না। বিধানসভায় কেবলমাত্র বাংলাদেশের ঘটনায় চিন্তা ব্যক্ত করে দ্রুত এর সমাধান চেয়ে দায় সেরেছে। পশ্চিমবঙ্গের মঠ-মিশন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিও যেন বাংলাদেশি হিন্দুদের পক্ষে অবস্থান নিতে দ্বিধাগ্রস্ত। ব্যতিক্রম শুধু বিশ্ব হিন্দু পরিষদ-সহ হিন্দুত্ববাদী সংগঠন। তারা এই ইস্যুতে কলকাতা, শিলিগুড়ি-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় প্রতিবাদ সভায় শামিল হয়েছে। তারা বুঝিয়ে দিয়েছে কেউ থাক বা না থাক, তারা সবসময় বাংলাদেশের হিন্দুদের পাশে আছে। এই রাজ্যের প্রধান বিরোধীদল বিজেপি এবং বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও বাংলাদেশের হিন্দুর বিরুদ্ধে ঘটে চলা অত্যাচারের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। কিন্তু এখানেই থেমে থাকলে চলবে না। যতক্ষণ না বাংলাদেশের সব হিন্দু নিরাপদ হচ্ছে, তাদের বাঁচার অধিকার সুরক্ষিত হচ্ছে, ততক্ষণ এপারের হিন্দু সমাজকে সক্রিয় প্রতিবাদ জানাতেই হবে। কারণ বাংলাদেশি হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদেরই পরমাত্মীয়। তাদের দুঃখের দিনে পাশে থাকা তাদের পরম কর্তব্য। সে কর্তব্যে শামিল নাই-বা হলো পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল, নাই-বা হলো বঙ্গের কমিউনিস্টরা, নাইবা হলো হিন্দু ফোবিয়ায় ভোগা সেকুলারকুল। সাধারণ হিন্দুই সে কাজ করবে। □

হাসিনা পরবর্তী বাংলাদেশ হিন্দু শূন্য করার ছক

খগেন্দ্রনাথ মণ্ডল

একটা জিনিস অনেকেরই দৃষ্টি এড়ায়নি--- তা হচ্ছে বাংলাদেশে কোটাবিরোধী বৈষম্যের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার আন্দোলন আদতে ছিল একটা জেহাদি আন্দোলন— যার পিছনে ছিল দেশি-বিদেশি চক্রান্ত। তা না হলে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট তাদের ২১ জুলাইয়ের (২০২৪)-এর রায়ে অপ্রত্যাশিতভাবে সরকারি নিয়োগে সংরক্ষণ ৫৬ শতাংশ (মুক্তি যোদ্ধা পরিবার ৩০ শতাংশ) থেকে ৭ শতাংশ নামিয়ে আনার পরেও কিন্তু আন্দোলনের ঝাঁঝ কমেনি। বরং ১০-১২ দফা থেকে দাবি ১ দফায় আসে— 'দফা এক, দাবি এক, হাসিনার পদত্যাগ'। ২০২৪-এর জুলাইয়ে শুরু হওয়া কোটা-বিরোধী আন্দোলন ছিল একেবারেই নিরামিষ। প্রশাসনিক অপদার্থতা এবং সেনাবাহিনীর নিষ্ক্রিয়তা আন্দোলনে অক্সিজেন দেয়। যার পরিণতি ঘটে গত ৫ আগস্ট স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশত্যাগের মাধ্যমে। আগস্টের ৪ তারিখ জেহাদি ছাত্ররা বঙ্গভবন (হাসিনার সরকারি বাসভবন) অবরোধের ঘোষণায় যখন রাজধানী ঢাকা শহর জনরোষে উত্তাল, তখনও সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামানের ঘোষণা— 'আন্দোলনকারীদের উপর সেনা গুলি চালাবে না'-এর সঙ্গে তুলনীয় ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট মুসলিম লিগের ডাইরেক্ট অ্যাকশনের আগের দিন বঙ্গের প্রিমিয়ার হুসেন সাইদ সুরাবর্দির ঘোষণা— 'আপনারা নির্ভয়ে ডাইরেক্ট অ্যাকশন পালন করুন। পুলিশ আপনাদের আটকাবে না।' যার ফলে ৭ হাজার মানুষের জীবন যায়, তবে পাকিস্তান কায়েম হয়। আর এরকম একটি চক্রান্তের ফল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশত্যাগ।

সাবাস মোল্লা মহম্মদ ইউনুস, যে স্বাধীনতার জন্য ৩০ লক্ষ মানুষের বলিদান এবং ২ লক্ষাধিক নারীর সম্মান লুট হয়েছে— সেই মাটিতে দাঁড়িয়ে আপনি ১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস দেখাতে পারেন--- এতে কিছু সংখ্যক রাজাকারকে খুশি করতে পারলেও যারা ভাষা আন্দোলন বা ৭১-এর মুক্তি যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত বা স্বজন হারিয়েছেন, বাংলাদেশের সেই গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষ কিন্তু প্রতিশোধের রোষে ফুঁসছেন, সুযোগ এলেই তারা রাস্তায় বের হবেন। ১৯৭৫ সালে জল্লাদরা শেষ মুজিবকে সপরিবারে হত্যা করে ভেবেছিল মানুষ ভয়ে গর্তে লুকিয়ে থাকবে, কিন্তু শেষাবধি তারাই ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। ইউনুস সাহেব যে কাজ করছেন এবং যার জন্য নোবেল পেয়েছেন তা কি সংগতিপূর্ণ? ইউনুস সাহেব নোবেলজয়ী, নোবেলের প্রতি সম্মান রেখে আপনি বলতে পারবেন— আপনার বর্তমান নিয়োগের বৈধতা কী? আপনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষের শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন--- হিন্দুরা যেহেতু স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি ছিল তাই আপনার নিয়োগকর্তাদের রোষ পড়েছে হিন্দুদের উপরে। তাঁদের জীবন, ধর্ম ও ধর্মস্থানের উপর অত্যাচারের খাঁড়া নেমে এসেছে। আর এটাই যেন বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ভবিতব্য— যে কোনো প্রতিকূলতা ঘটনার সাক্ষী তাঁরা।

কেন এমন হবে? চোদ্দপুরুষের ভিটামাটি ছেড়ে কেন পালাবে হিন্দুরা? তাই এবার হিন্দুরা অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার, প্রতিবাদমুখর। স্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়েরা, গৃহবধূরা রাস্তায় নেমে স্লোগান দিচ্ছে 'এ দেশ আমার—এ মাটি আমার— এ মাটি আমার, এদেশ আমরা ছাড়ব না, এদেশ কারুর বাপের নয়'— এটা কি অন্যায় না দেশ-বিরোধিতা? তা যদি না হয়, তাহলে তাদের সবক শেখাতে চট্টগ্রামের হাজারি পট্টিতে ইসকনের বিরুদ্ধে কুমন্তব্যের প্রতিবাদে সংখ্যালঘুদের জমায়েত আক্রমণকারীদের আড়াল করে, আক্রান্তদের উপর পুলিশ-মিলিটারির অত্যাচার কেন হবে? আমরা দূর থেকে আন্দাজ করতে পারছিলাম, আক্রান্ত সংখ্যালঘুদের ঐক্যবদ্ধভাবে রাস্তায় নামার ঘটনাকে

ভারতের মদত ধরে নিয়ে এবং চিরদিন মার হজম করা হিন্দুদের হঠাৎ মাঠে নামার ব্যাপারটিকে বাংলাদেশের বর্তমান অবৈধ সরকার এবং মোল্লাবাদীরা কখনোই মেনে নেবে না— কোনো না কোনো অছিলায় তাদের উপর আক্রমণ করা হবেই।

বাংলাদেশে সংস্কারের নামে নানা অছিলায় হিন্দুদের জীবন ও সম্পত্তির উপর নানা নিষেধাজ্ঞা নেমে আসবে— এবারে দুর্গাপূজায় যেমন লাউড স্পিকার বাজানো, এমনকী ঢাক, কাঁসর, শাঁখ বাজানো নিষিদ্ধ করেছিল মুসলমানের আজান ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়। এটা হিন্দুদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় একটি বিশাল হস্তক্ষেপ। কেননা পূজার রীতি অনুসারে তিথি-নক্ষত্র অনুযায়ী পূজার নির্ঘণ্ট পালিত হয়, নামাজের সময় মন্দিরে মাইক দূরস্থান সন্ধ্যারতির ঘণ্টাও বাজবে না— এরকম পরিস্থিতি তালিবানি আফগানিস্তানেও আছে কিনা জানা নেই।

গত ১৫ বছর প্রধানমন্ত্রী হাসিনার শাসনকালে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের নিয়োগের ক্ষেত্রে বৈষম্য না থাকায় বহু হিন্দু প্রশাসনে, বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিভাগে উচ্চপদে আসীন হয়েছিলেন, তাঁদের অনেককেই পদ থেকে সরানো বা পদচ্যুত করা হয়েছে। এদের মধ্যে বুয়েট ও কুয়েট প্রকশৌল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল বা বিভাগীয় প্রধান, এমনকী বিদ্যালয়ের প্রধান/সহকারী শিক্ষকরাও রয়েছেন। এদের অপরাধ কী তা কেউ খোলসা করে বলেননি। অনেককে শারীরিক নিগ্রহ করে জোরপূর্বক পদত্যাগপত্র লিখিয়ে নেওয়া হয়েছে। পদত্যাগীদের মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, অ্যাটর্নি জেনারেল-সহ হাইকোর্টে সুপ্রিম কোর্টের অনেক বিচারপতি। এদের অপরাধ এদের হাসিনা সরকার নিয়োগ করেছে, এদের মধ্যে অনেক সংখ্যালঘু সমাজের মানুষ রয়েছেন।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের হিন্দুরা সে অর্থে কখনোই ন্যায়বিচার পায়নি— বঞ্চনা, বৈষম্য ও অত্যাচার হিন্দুদের দেশ ছাড়া করে তাদের সম্পত্তি দখল একটি চলমান ঘটনা। সেক্ষেত্রে আওয়ামি লিগ নেতারাও পিছিয়ে নেই। তাই এবারে যখন সীমানা বন্ধ করে দিয়ে ভারত শরণার্থী প্রবেশ বন্ধ করে দিয়েছে, তখন মোল্লাবাদীদের হিন্দু তাড়ানোর প্রকল্প সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়েছে। অতীতে হিন্দুদের উপর অত্যাচার হলেও, অনেক অপ্রাপ্তির শিকার হলেও নবলব্ধ স্বাধীনতার ভিত্তি 'দ্বিজাতি তত্ত্বের অবসান' এরকম এক আবেগে আবিষ্ট ছিল। মোল্লা ইউনুসের তত্ত্বাবধানে সেই মরীচিকাও খারিজ করে দেওয়া হলো। শেখ হাসিনা যদি আদালতের বিচারে গণহত্যাকারী সাব্যস্ত হয়, তাহলে দেশের সংবিধান অনুসারে তাঁর বিচার হোক, কিন্তু তাদের জাতির জনকের মূর্তি ভাঙ্গা কেন? তিনি তো মুক্তিযুদ্ধে পাকসেনার সহযোগী রাজাকারদেরও সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন— তারা পাক-সহযোগী হলেও বাঙ্গালি বলে, সেই মুজিবের মূর্তি ভাঙ্গা, এমনকী বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও রেয়াত করা হচ্ছে না কেন?

ইউনুস সাহেব এটাকে মুক্তি উত্তেজনা হিসেবে ব্যাখ্যা করলেও, তাতে মূল অ্যাজেন্ডা চাপা পড়ে না। কোথায় বাংলাদেশের সুশীল সমাজ, সাহিত্যিক-শিল্পীরা? ইউনুসের ভয়ে সবারই মৌনীবাবা অবস্থা।

ওদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম— পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী-সাহিত্যিক, রবীন্দ্র অনুরাগীরা কোথায়? কোথায় নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেন— যাঁর নামকরণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং? পশ্চিমবঙ্গে তো মত প্রকাশ করলেই মুণ্ডচ্ছেদনের ভয় নেই— তাহলে কার স্বার্থে তাঁরা নীরব? এটা নয় কি শুধু তোষণের রাজনীতি? রবীন্দ্রনাথ হয়তো সেই কারণেই ১৯৩৩ সালের ১৬ অক্টোবর একটি প্রসঙ্গে তাঁর গুণগ্রাহী হেমন্তবালা দেবীকে লেখেন— 'প্রতিদিন নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা মুসলমান ও খ্রিস্টান হতে চলেছে, কিন্তু ভাটপাড়ার (প্রাচীন বঙ্গে পণ্ডিতদের মক্কা) চৈতন্য নেই। একদা ওই তর্করত্নদের প্রপৌত্রমণ্ডলীকে মুসলমানরা যখন জোর করে কলেমা পড়াবে তখন পরিতাপ করার সময় থাকবে না' (৯ অক্টোবর ২০২৪, স্বস্তিকা পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি)। রবীন্দ্রনাথের এই দর্শন/ প্রবচনের প্রক্রিয়া পশ্চিমবঙ্গে এখনও মাত্রা না ছাড়ালেও, পূর্ববঙ্গে এই ঘটনা সর্বগ্রাসী রূপ নিয়েছে— সমস্ত বিশ্ব এ বিষয়ে সরব হলেও, পশ্চিমবঙ্গে আমরা নির্বাক সেজেছি।

বৈষম্য হঠাতে ও গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবনের আন্দোলনের অভিমুখ এখন আওয়ামি লিগ ও হিন্দু বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হওয়ায়, আন্দোলনের তরুণ মুখগুলি কালিমালিপ্ত হলো আর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন পিছনের দরজা দিয়ে সফল হলো মহম্মদ ইউনুসের। তিনি এখন কোনোরকম গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যেতে অনাগ্রহী। নানা অছিলায় কমিটি, সংস্কারের কুমির ছানা দেখিয়ে ভোট পিছিয়ে দেওয়ার তালে আছেন, কিন্তু এটা দীর্ঘদিন চালানো যাবে না। বাংলাদেশের মানুষের বিপ্লবপ্রবণ মানসিকতার পুনঃস্ফুরণ ঘটবেই— এই অন্ধকার চিরস্থায়ী হতে পারে না।

এবারের ইতিবাচক দিক হচ্ছে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া হিন্দুদের মধ্যে রুখে দাঁড়ানোর মনোভাব। এদের সংখ্যা যখন (দেশভাগের সময়) ২৭ শতাংশ ছিল তখনও যে মেরুদণ্ড হিন্দুরা দেখাতে পারেনি, তা ৭ শতাংশ সংখ্যালঘু সম্ভব করেছে, এই জন্য তাঁদের কুর্নিশ। আর এর পিছনে ইসকনের অকুতোভয় যে সন্ন্যাসীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কোণঠাসা ভগ্নহৃদয়, হতোদ্যম হিন্দুদের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করেছেন তাঁদের প্রতি শুভেচ্ছা। অভিনন্দন জানাই বাংলাদেশের হিন্দুদের যারা পুলিশের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে চট্টগ্রাম, রংপুর, খুলনা ও বগুড়ায় লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাবেশে করার সাহস দেখিয়েছেন। মরিয়া সংখ্যালঘুদের এছাড়া শেষ রক্ষার কী উপায়? সর্বশেষ খবরে জানা যায় সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র চিন্ময়কৃষ্ণ প্রভুকে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে গ্রেপ্তার করে জেলে পোরা হয়েছে— তার প্রতিবাদে ভারত-সহ গোটা বিশ্বে নিন্দার ঝড় উঠেছে। এটা ইউনুসের শেষের শুরু।

□

বাংলাদেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ আসন্ন দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে দেশ

সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী

ভয়ানক এক বিপর্যয় বাংলাদেশে অনতিবিলম্বেই প্রচণ্ড আঘাত করবে। আঘাতে চুরমার হয়ে যাবে যা কিছু অবশিষ্ট। প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনুসের ভাষায় সব কিছু 'লডরফডড়' হয়ে যাবার সংকেত তিনি দিয়ে রেখেছেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে দেশটিতে কোনো কিছুই ছিল না। সব কিছুই ধ্বংস করে দিয়েছিল পাকিস্তানি সেনারা। ছিল না কোনো রিজার্ভ শিল্প কারখানা। চারদিকে হাহাকার আর স্বজন হারার শোক। রাজপথে মৃতদেহ আর রক্ত। এরই মধ্যে সবার অলক্ষ্যে গড়ে উঠেছিল এক লুটেরাদের দল।

বুদ্ধিজীবী হত্যার সংস্কৃতি হতে বাংলাদেশ এখনো বেরোতে পারেনি। মূর্খতার কৃষ্টি সেখানে আজ ফলে ফুলে পল্লবিত। ধর্মনিরপেক্ষতা তো দূরের কথা। তারা শুধুই ইসলাম নিয়েই ব্যস্ত। সব জায়গায় ইসলামীকরণ তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। সর্বত্র বেহেস্তে যাওয়ার প্রতিযোগিতা। তারা সবাই বেহেস্তে যাবে, সবাই ৭২টি করে হুর পাবে। আপাতত তারা সে নিয়েই মশগুল। এইসব করে তাদের সঙ্গে মানুষের যে তফাত তৈরি হচ্ছে, সে কথা বলার কেউ নেই। কিন্তু হুরে তো আর পেট ভরে না। পেটে দানাপানি দিতে হয়। সবাই যদি ইসলাম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যায় তা হলে উৎপাদনে ও দেশ নির্মাণে কারা কাজ করবে? মোল্লাবাদী মূর্খ মুসলমানরা বলে বেড়াচ্ছে যা কিছু দরকার আল্লাই দেবে।

আল্লাই যদি দেবে তাহলে কাজকর্ম করার কী দরকার? আর সে কারণেই উৎপাদনের ক্ষেত্র হিসেবে মসজিদ-মাদ্রাসাকে শিল্প হিসেবে বিবেচিত করা হয়েছে। সম্প্রতি তারা আবার নিজ গৃহে ও দাসী গৃহে সন্তান উৎপাদনের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ। যে যত অধিক সন্তান উৎপাদন করতে পারবে সে তত তাড়াতাড়ি বেহেস্তে যাবে এবং অনন্তকাল হুর নিয়ে দিনরাত্রি যাপন করতে পারবে। ১৯৪৭ সালে যে সকল কারণে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল সে কারণগুলির সঙ্গে এবার নতুন কিছু বিষয় যোগ হওয়ার

পর তা আরও ভয়াল রূপে দাপট দেখাবে ২০২৫-এর দুর্ভিক্ষ।

সারা দেশে হিংসা হানাহানি, হিন্দুদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান-সহ যেখানে যা কিছু আছে তাতেই ধ্বংসলীলা চালানো হয়েছে। সেখানে অবশিষ্ট আর কিছু নেই। উৎপাদন ব্যাহত, কৃষি উপেক্ষিত, শিল্পের বিনাশ। যে শিল্পকে ভর করে দেশ এগিয়ে গেছিল সেই গার্মেন্টস শিল্পকে এরই মধ্যে দেউলিয়া বানিয়ে দিয়েছে। বিদেশি ক্রেতারা তাদের কর্মাদেশ দিচ্ছেন না বাংলাদেশকে। ফতোয়া জারি করা হয়েছে কোনো মহিলা ও মেয়ে গার্মেন্টস শিল্পে কাজ করতে পারবে না। ডোমেস্টিক অর্থনীতির রক্ত সঞ্চালন স্থবির করে দেওয়া হয়েছে। বেকার হয়ে গেছে অন্তত এক কোটি মহিলা শ্রমিক। তাদের শুধু যৌন চাহিদা মেটানোর যন্ত্রে পরিগণিত করা হয়েছে। যে মহিলারা ছিল দেশের অর্থনীতির প্রধান শক্তি, তারা কর্মহীন হয়ে ঘরে ফিরে যাচ্ছে। এর প্রভাব পড়বে গ্রামীণ অর্থনীতিতেও। বিনাশ নেমে আসতে বাধ্য তাদের অর্থনীতিতে।

দেশটিতে সবাই নেমে গেছে হিন্দু নিধন, ভারত বিরোধী কাজকর্মে। তাতে মিথ্যার সাগরে ডুবে যাচ্ছে সমগ্র দেশ। দেশটিতে একটি অরাজকতা বিরাজমান। কারও কথা কেউ শুনছে না। প্রশাসন হয়ে গেছে স্থবির। ভয়ে ভয়ে কেউ কোনো কাজ করছে না। পিচ্চি পিচ্চি ছেলেদের আস্ফালন দেখে অবাক হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কৌশলে মানুষে মানুষে

হানাহানিতে লিপ্ত করে দিয়ে লুণ্ঠনে মগ্ন করে দেওয়া হয়েছে। সবাই লেগে আছে ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে। ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়া। দেশটিতে কেউ লেগে আছে হিন্দু নিধনে, কেউ আছে মন্দির গুঁড়িয়ে দেওয়ার কাজে। কেউ আছে আমলাদের গামলা ভাঙার কাজে। আর এক শ্রেণী আছে ভারত বিরোধিতায়।

এই ফাঁকে ভেস্টেড সুবিধাভুগিরা গেড়ে বসেছেন। প্রশমিত করে যাচ্ছেন দীর্ঘদিনের জমে থাকা প্রতিশোধের নেশা। দেশ যে ভিখারি হতে চলেছে সেদিকে কারও নজর নেই। আমদানি নির্ভর দেশটি নির্ভর করে আছে একমাত্র পাকিস্তানের করুণার কাছে। অথচ, পাকিস্তান নিজেই ব্যর্থদেশে পরিণত হয়ে গেছে অনেক আগেই। তাদের কাছ থেকে বিনামূল্যে আমদানি করা হয়েছে অবৈধ অস্ত্র। যারা ভাত খেতে পায় না তাদের খাদ্য আমদানি না করে অস্ত্র আমদানি করার পেছনে কী উদ্দেশ্য তা বোঝার বাকি নেই। একদল নব্য জেহাদি তৈরি করে তাদের হাতে সেগুলি বণ্টনের কাজ শুরু হয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও অস্ত্রের ভাণ্ডার গড়ে তোলা হয়েছে। সন্ত্রাসী ও দাগি আসামিদের জেল থেকে মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। নৈরাজ্য সৃষ্টির জন্য যা কিছু করা দরকার তা সবই করা হয়েছে।

এদিকে ব্যাংকগুলি দেউলিয়া হয়ে গেছে। গ্রাহকরা তাদের টাকা তুলতে পারছেন না। রিজার্ভ তলানিতে গিয়ে পৌঁছেছে। এর মধ্যে সমন্বিত শক্তিকে দেশ গড়ার কাজে না লাগিয়ে ব্যাপক হিংসায় বিনিয়োগ করা হয়েছে। এই হিংসার সামাজিক শাস্তি বিপর্যস্ত করে চলেছে। মানুষে মানুষে দূরত্ব বেড়েই চলেছে। এখন এখান থেকে বের হয়ে আসা আর সম্ভব নয়। ক্রমশ দেশ সামাজিক শক্তি হারাচ্ছে। সামাজিক শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে গেছে। ব্যাপক লুটপাট যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে গভীর খাদের পাড়ে। দেশ পরিচালনায় অদক্ষতা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়ে উঠেছে। পরহিংসার বাজে সংস্কৃতি বাংলাদেশকে ভালোভাবে পেয়ে বসেছে। মেধা শূন্যতার কারণে দেশটি হতভাগা দেশের তালিকায় নিজেই নাম লেখাচ্ছে। শত বছরের ক্ষতকে চুলকিয়ে আরও গভীর ক্ষতে পরিণত করা হচ্ছে। যে যার মতো আচরণ করছে। যা করছে সকলই যেন ভালোই করছে। দেখার ও বিচার করার কোনো প্রয়োজনবোধ কারওরই দেখা যাচ্ছে না।

ইউনুস পরিচালিত সরকার দেশটাকে এমন হতদরিদ্র বানিয়ে ছাড়বে, যাতে আবারও সুদের ব্যবসা চাঙ্গা করে তার হারানো প্রতিষ্ঠানগুলি শক্তিশালী করে তুলবে। এটা যে তার কৌশলী পায়তারা সেটা বোঝার কেউ নেই। বাহবা দিচ্ছে সকলে মিলে। হাততালির ধুম লেগে গেছে। দেশটা এগিয়ে যাওয়ার জন্য যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল সে জায়গায় ফিরে আসা এখন দুরূহ ও অসম্ভব। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে দেশটির কোনো অভিভাবক নেই। এই অবস্থা চরম নৈরাজ্যের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ফলে কিছু লোক হয়ে গেছে দেশের মালিক আর বাকিরা সেই আগের চাইতে অনেক পেছনে বাছুরের মতো ছুটছে। ছুটে তো যাচ্ছেই আগুনে পড়ছে নাকি গভীর খাদে নিপতিত হচ্ছে তারা সেটা বুঝতে পারছে না।

ফলে অঘোষিত যুদ্ধে বিপর্যস্ত হতে বাধ্য হবে বাংলাদেশ। ফলশ্রুতিতে '৭৪-এর চাইতেও ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ শূন্যতা প্রকট অর্থনৈতিক সংকটের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে অনতিবিলম্বেই দেশটি দেউলিয়া হয়ে যাবে। পরিণত হবে ব্যর্থ দেশে। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। □

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

বিচারব্যবস্থার অসহায়তা এবং মোল্লাবাদীদের দাপাদাপি

একটি গণতান্ত্রিক দেশের আদালত যে স্বাধীনতা এবং নিরপেক্ষতার প্রতীক, সেই ভূমিকা বাংলাদেশে ধূলিসাৎ হয়েছে।

ধর্মানন্দ দেব

অশিক্ষার হার দেশে বেশি হলে কী ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সেটাই আরও একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। অশিক্ষা কেবল ব্যক্তিগত জীবনের সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ থাকে না, এটি সামগ্রিকভাবে জাতীয় অবস্থার অবনতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশে উচ্চ অশিক্ষার হারকে গণতন্ত্রের অবক্ষয় এবং মজহবি গোঁড়ামির উত্থানের জন্য অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

বাংলাদেশ আজ গণতান্ত্রিক মতাদর্শ ছেড়ে পাকিস্তানের মতো উগ্র মজহবি মোল্লাবাদ এবং চরম স্বৈরাচারের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। অথচ আধুনিক বিশ্বে গণতন্ত্রই একমাত্র উত্তরণের পথ। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, পন্থনিরপেক্ষতা এবং মানবাধিকারের প্রতি সকলের শ্রদ্ধাশীল থাকার কথা, কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশ সেই পথ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছে।

মহম্মদ ইউনুসের ব্যর্থতার চিত্র এতটাই স্পষ্ট যে, দেশের সংখ্যালঘুদের প্রতি হওয়া অত্যাচার এবং মোল্লাবাদীদের অবাধ দাপাদাপি বাংলাদেশ প্রশাসন-অনুমোদিত বলে পরিষ্কার বোঝা যায়। সংখ্যালঘুদের প্রতি নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করা তো দূরের কথা, তিনি নিজেই এমন একটি প্রশাসনিক কাঠামো দাঁড় করিয়েছেন যেখানে হিন্দু এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জীবন সর্বক্ষণ বিপন্ন। এটি নোবেলজয়ীর কাছ থেকে এক লজ্জাজনক এবং অমার্জনীয় ব্যর্থতা।

শুধু দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থা নয়, ভারতের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী দেশের সঙ্গেও সুসম্পর্ক নষ্ট করার পথে তিনি বড়ো ভূমিকা পালন করছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পিছনে ভারতের ভূমিকা এবং ত্যাগের কথা ভুলিয়ে দিতে সেই দেশের ইতিহাসের পুনর্লিখনের প্রচেষ্টা চলছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কয়েক হাজার ভারতীয় সেনা তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, যা দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে একটি অদ্বিতীয় অধ্যায়। কিন্তু সেই ইতিহাস আজকের প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার বদলে তাকে বিকৃত করার চেষ্টা চলছে।

বাংলাদেশে অশিক্ষার কারণে মানুষের মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ গড়ে উঠছে না। গণতন্ত্রের স্বাভাবিক নিয়মগুলি সম্পর্কে মানুষের ধারণা না থাকার ফলে, মোল্লাবাদী ও স্বৈরাচারী শক্তিগুলি সহজেই তাদের প্রভাব বিস্তার করছে। সাধারণ মানুষ নিজস্ব অধিকার সম্পর্কে অজ্ঞ থাকায় তারা শোষণের শিকার হচ্ছে। শিক্ষার অভাব শুধু ব্যক্তি নয়, পুরো সমাজ ও দেশকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে।

আজকের পরিস্থিতি থেকে এটা সম্পষ্ট যে, বাংলাদেশে গণতন্ত্র, ধর্মীয় সহাবস্থান এবং মানুষের মৌলিক অধিকারের পক্ষে বড়ো বিপদ হলো জেহাদি মোল্লাবাদ। মজহবি মোল্লাবাদ শুধু বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের উপরই নয়, বরং সামগ্রিকভাবে জাতির উপরও আঘাত হানছে।

প্রভু চিন্ময়কৃষ্ণ দাস একজন হিন্দু সন্ন্যাসী, যিনি বাংলাদেশে নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষার জন্য আওয়াজ তুলেছিলেন। তাঁর এই সাহসী উদ্যোগ মোল্লাবাদীদের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হয়নি। ফলত, তাঁকে দেশদ্রোহের মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর জামিনের আবেদন একাধিকবার খারিজ হয়েছে এবং শুনানি বিলম্বিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম দায়রা আদালতে তাঁর হয়ে সওয়াল করার জন্য কোনো আইনজীবীকে দাঁড়াতে দেওয়া হয়নি। ৫১ জন আইনজীবী, যাঁরা তাঁর পক্ষে সওয়াল করতে চেয়েছিলেন, তাঁদের প্রাণে মারার হুমকি দিয়ে আদালত কক্ষে প্রবেশে বাধা দেওয়া হয়েছে। পুলিশ ও মোল্লাবাদীরা এমন একটি পরিবেশ তৈরি করেছে, যাতে প্রভু চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের জামিন পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলস্বরূপ, তাঁকে আরও এক মাস জেলেই কাটাতে হবে। এর পরের শুনানির দিন ধার্য হয়েছে জানুয়ারি মাসের ২ তারিখ। তবে প্রশ্ন উঠেছে, সেদিনও কি কোনো আইনজীবী তাঁর পক্ষে সওয়াল করার সাহস দেখাতে পারবেন?

এই ঘটনার গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হলো, যাঁরা তাঁর পক্ষে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন, তাঁদের উপর চরম অত্যাচার করা হয়েছে। দু'জন আইনজীবীকে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করা হয়েছে এবং তাঁরা বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। একজনের অবস্থা এতটাই গুরুতর যে তিনি আইসিইউতে রয়েছেন। এছাড়াও, যাঁরা প্রভু চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের জন্য খাবার নিয়ে জেলে গিয়েছিলেন, তাঁদেরও পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। এর ফলে, তিনি জেলের খাবার গ্রহণ করতে তাঁর অসম্মতি জানিয়েছেন এবং এক প্রকার অনশনে চলে গিয়েছেন।

প্রশ্ন হচ্ছে, কেন আদালত পরবর্তী শুনানির দিন এক মাস পরে নির্ধারণ করল? তার আগে কেন নয়? এই বিলম্ব বিচার ব্যবস্থার উপর সরকারের প্রভাব এবং প্রভু চিন্ময়কৃষ্ণ দাসকে নির্যাতনের কৌশল ছাড়া আর কিছু নয়। একটি গণতান্ত্রিক দেশের আদালত যে স্বাধীনতা এবং নিরপেক্ষতার প্রতীক, সেই ভূমিকা বাংলাদেশে ধূলিসাৎ হয়েছে। বিচারব্যবস্থা মোল্লাবাদী চাপের কাছে মাথা নত করেছে, যা দেশের সার্বিক আইনের শাসনের জন্য ভয়ানক বিপদের লক্ষণ!

বাংলাদেশে হিন্দু এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিত হচ্ছেন। তাঁদের মঠ-মন্দিরে হামলা করা হচ্ছে, বাড়িঘর ভাঙচুর করা হচ্ছে এবং তাঁদের ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপনে বাধা দেওয়া হচ্ছে। কিশোরী মেয়েদের অপহরণ, নির্যাতন এবং তাদের ধর্মান্তরিত করার ঘটনা নিত্যদিনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতি একদিকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের চূড়ান্ত উদাহরণ, অন্যদিকে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক চরিত্রকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। গণতান্ত্রিক দেশের বিচারব্যবস্থার নীরব ভূমিকা আশ্চর্যের!

১৬ডিসেম্বর ১৯৭১ ১৬ডিসেম্বর ২০২৪

গোপাল চক্রবর্তী

ষোলো ডিসেম্বর বিজয় দিবস। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ, রাতে পাকবাহিনী অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে পূর্ববঙ্গের মানুষদের ওপর। সেনানিবাস থেকে বেরিয়ে আসে বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর (সীমান্ত রক্ষী বাহিনী)। তারা প্রতিরোধ করে পাকবাহিনীর। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে সেই প্রতিরোধও ভেঙে পড়ে। তারপর শুরু হয় পূর্ব পাকিস্তানে পাকসেনাদের নির্মম অত্যাচার। ক্রমে সেই অত্যাচারের লক্ষ্য হয় হিন্দু সমাজ। খুন, ধর্ষণ, অবাধ লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ হয়ে ওঠে নিত্যকার ঘটনা। দলে দলে হিন্দু সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে আশ্রয় নেয়। শরণার্থীর দলে অবশ্য আওয়ামি লিগ নেতৃত্ব ও বুদ্ধিজীবীর সংখ্যাও কম ছিল না। পাকবাহিনীর সঙ্গে তখন যোগ দিয়েছে স্থানীয় মুসলিম লিগ, জামায়েতে ইসলামির সদস্যরা। একথা ঠিক যে সেই সময়ে আজকের মতো এত জঙ্গি সংগঠনের অস্তিত্ব ছিল না। নামমাত্র সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে রাজাকার, আলবদর, আলশামস প্রভৃতি দলকে তখন মাঠে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এক একটি হিন্দু গ্রাম ঘিরে ফেলে ভোর রাতে। রাজাকার, আলবদর এবং স্থানীয় লুটেরার দল পাকসেনাদের পথ চিনিয়ে নিয়ে যায়। ভোর হতে না হতেই চলে গ্রামের পর গ্রাম আক্রমণ। যে কোনো পুরুষ সামনে এলে তাকে হত্যা করা হয়। মহিলাদের ওপর চলে গণধর্ষণ, বাড়িতে অগ্নিসংযোগ আর অবাধ লুটপাট। হানাদাররা চলে যাওয়ার পর এক একটা গ্রাম যেন মূর্তিমান নরক।

এবার মানুষ পালাতে শুরু করে প্রথমে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে, পরে ভারতে। পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলি তখন এইসব নিপীড়িত অসহায় মানুষদের একমাত্র আশ্রয়। সেদিন ভারত সরকার সীমান্ত খুলে দিয়েছিল। সীমান্তবর্তী শরণার্থী শিবিরগুলিতে লক্ষ লক্ষ মানুষের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। সামরিক বাহিনী সেদিন বাঙ্গালি যুবকদের সংক্ষিপ্ত সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে মুক্তিবাহিনী তৈরি করে সহজে বহনযোগ্য অস্ত্রসম্ভারে সুসজ্জিত করে দিয়েছিল। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় জুনমাস থেকে মুক্তিবাহিনী চোরাগোপ্তা আক্রমণ শুরু করে। এর মধ্যেই বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার তৈরি হয়েছে। সম্প্রচার শুরু করেছে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। সেই নৈরাজ্য আর নৈরাশ্যের সময়ে আকাশবাণী, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ও বিবিসি-র বাংলা সম্প্রচার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও আশাব্যঞ্জক ভূমিকা পালন করেছিল। নিরাশার অন্ধকারে তারা আশার আলো দেখিয়েছে। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সেই সময়ে প্রায় সারা বিশ্ব পরিক্রমা করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে সমর্থন আদায় করেছিলেন। একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন ছাড়া বিশ্বের প্রায় সমস্ত দেশ ভারত ও বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে ছিল। সবথেকে বড়ো ভূমিকা নিয়েছিল তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সব রকম সাহায্য করেছিল রুশ প্রশাসন। এমনকী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রস্তাব জাতিসঙ্ঘে 'ভেটো' প্রয়োগ করে রাশিয়া নস্যাৎ করে দিয়েছিল। অবশেষে সবদিকে আটঘাট বেঁধে ৩ ডিসেম্বর ভারত স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ৪ ডিসেম্বর এক ভয়ংকর নৌযুদ্ধে পাকিস্তানকে পর্যুদস্ত করে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মুক্তিবাহিনী এবং বাইরে ভারতীয় সেনার সাঁড়াশি আক্রমণে পাকবাহিনী ক্রমশ কোণঠাসা হতে থাকে। ভারতীয় বাহিনী পাকসেনার সমস্ত রকম যোগাযোগ ও সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। নিরুপায় পাকবাহিনীর প্রধান জেনারেল নিয়াজি ৯৩ হাজার সেনা-সহ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ভারতের পূর্বাঞ্চল কমান্ডার জগজিৎ সিংহ অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। স্বাধীনতাকামী বাঙ্গালির সেদিনের আবেগ আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

৫৩ বছর পর আরেকটা ১৬ ডিসেম্বর এসেছে। গত ৫ আগস্ট জেহাদি অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনাকে বিতাড়িত করা হয়েছে। বাংলাদেশে এখন চলছে এক চরম নৈরাজ্য। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যে বাঙ্গালি, তারা আজ বিপর্যস্ত অনিশ্চয়তার আর নিরাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত। ত্রিশ লক্ষ নিহত, অসংখ্য মা-বোনের সম্ভ্রম আর অশ্রুর বিনিময়ে অর্জিত যে স্বাধীনতা তা আজ মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী, বঙ্গসংস্কৃতি বিরোধী কতগুলি হিংস্র, ধর্মান্ধ, জেহাদি রক্তলোলুপ নরপিশাচদের পদদলিত। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীরা আজ জোট বেঁধেছে। ৭১-এ হিন্দুরা যেমন আক্রান্ত হয়েছিল, আজও তেমনি হচ্ছে। পাকিস্তান আমলে শিক্ষা, সংস্কৃতির যেমন ইসলামীকরণ হয়েছিল, এখনও সেই প্রক্রিয়া চলছে। সেদিনও বিকৃতমনাদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল রবীন্দ্রনাথ। আজও বিকৃত সেই জেহাদি শক্তির আক্রমণের লক্ষ্য রবীন্দ্রনাথ। সময় এগুচ্ছে, বিশ্ব এগুচ্ছে, সংস্কৃতি এগুচ্ছে। কিন্তু সেই বিকৃত মানসিকতার ধ্বজাধারীরা ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে। ভয় হয়, কিন্তু ভরসাও আছে।

এক সময়ে পূর্ব পাকিস্তনে বাংলা বাদ দিয়ে উর্দুকে সরকারি ভাষা করার প্রস্তাব এসেছিল, বাংলা হরফ বাদ দিয়ে উর্দুতে লেখার প্রক্রিয়াও প্রায় চালু হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ভাষা আন্দোলন হয়েছে, ২১ফেব্রুয়ারি এসেছে। কবি বলেছেন, 'মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয়, আড়ালে তার সূর্য হাসে।' সত্যি '৭১ সালে ঘন মেঘের আড়ালে থেকে সূর্য দেখা দিয়েছিল। ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪-এর পুঞ্জীভূত মেঘও হয়তো অপসারিত হবে। মুক্তিযুদ্ধের হাতিয়ার হয়তো আবার গর্জে উঠবে, নিপীড়িত অসহায় হিন্দুদের পাশে দাঁড়াবে ভারতবর্ষ।

মা সারদা

এক অনন্য মাতৃত্বের অধিকারিণী

পারমিতা গুপ্ত

বাংলায় একটি কথা আছে— মা হওয়া কি মুখের কথা, শুধু প্রসব করলেই হয় না মাতা। এটি যেমন আদ্যন্ত সত্যি, তেমনি উলটোটাও সত্যি। সন্তানের জন্ম না দিয়েও মা হয়ে ওঠা যায় এবং এর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ জায়া সারদা দেবী। তিনি অগণিত ভক্তের জননী। এক স্নেহময়ী মাতা হয়ে মঠ মিশনের সন্ন্যাসী-সহ লক্ষ লক্ষ ভক্তকে তিনি আগলে রেখেছিলেন।

তাঁর স্নেহের বন্ধনে একদিকে যেমন বাঁধা পড়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ থেকে নিবেদিতার মতো ব্যক্তিত্ব অন্যদিকে রয়েছে সাধারণ মানুষ, চোর-ডাকাত-সহ পতিত নর-নারীও। সন্তানদের নিয়ে বাছবিচার মায়ের ছিল না। সকলেই তাঁর কাছে সমান। তিনি নিজেই বলেছেন, ‘‘আমি সতেরও মা, অসতেরও মা।’’ ‘‘আমার ছেলে যদি ধুলো-কাদা মাখে আমাকেই তো ধুলো ঝেড়ে কোলে তুলে নিতে হবে।’’ এই করুণারসেই তিনি সকল ভক্তকে স্নেহসিক্ত করে গিয়েছেন। তিনি ছিলেন করুণার প্রতিমূর্তি।

একবার এক মহিলা মায়ের হাত থেকে খাবার থালা নিয়ে ঠাকুরকে খেতে দিতে গিয়েছিল। সাধারণের চোখে সেই মহিলা ছিল ভ্রষ্টা। ঠাকুর অসন্তুষ্ট হন এবং ওই খাবার গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। পরে একটি শর্তে খেতে রাজি হন। সেটি হলো ওই ধরনের কারোর হাতে খাবার পাঠানো চলবে না। প্রত্যাশিত ছিল মা ঠাকুরের কথা মেনে নেবেন। কিন্তু মা ঠাকুরকে করজোড়ে জানিয়েছিলেন ‘তা তো আমি পারব না ঠাকুর । আমায় মা বলে চাইলে আমি তো থাকতে পারব না।’ শেষপর্যন্ত ঠাকুর হাসিমুখে খেলেন। মাতৃস্নেহ জয়ী হলো।

ঠাকুরও বোধহয় মাতৃত্বের এই উত্তরণ দেখতেই চেয়েছিলেন। কারোর অধঃপতন হলে সমাজ তাকে ঘৃণার চোখে দেখে। মা কিন্তু তাদের পরম স্নেহে বুকে টেনে নিয়ে তাদের কাছে বটবৃক্ষ স্বরূপ এক আশ্রয় হয়ে উঠতেন। তারাও মায়ের ভালোবাসার অগ্নিতে শুদ্ধ হতো। অশ্রুসিক্ত হয়ে পাপ স্খলন করত। কেউ কিছু বললে মায়ের বক্তব্য ছিল— ‘‘ভাঙতে সবাই পারে, গড়তে পারে কজনে? নিন্দা ঠাট্টা করতে পারে সবাই, কিন্তু তাকে ভালো করতে পারে কজনে? দুর্বলতা তো মানুষের আছেই।’’

কী সুদূরপ্রসারী চিন্তা! মাতৃস্নেহ দিয়ে চরিত্র সংশোধনের কী অভিনব প্রয়াস! এখানেই তাঁর অনন্যতা।

সেকালে জাতপাতের ভেদাভেদ ছিল সাংঘাতিক। কিন্তু মা ধর্ম-বর্ণ-জাতিভেদের এই ধারণার মূলে বারবার সজোরে কুঠারাঘাত করেছেন। নিম্নবর্ণের মানুষদের কাছে বসিয়ে অন্ন পরিবেশন করেছেন। তাদের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করেছেন। অনেক বাধা সত্ত্বেও তাঁকে একাজ থেকে নিবৃত্ত করা যায়নি। ভগিনী নিবেদিতা একবার ঠাকুরের জন্য ভোগ রান্না করে, ঠাকুরকে নিবেদন করে মাকে দেন। মাও তৃপ্তির সঙ্গে তা খান। বিধর্মীর হাতে তৈরি রান্না মা খেয়েছেন বলে বাগবাজারের রক্ষণশীল মহিলামহলে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। মা তাতে কর্ণপাত করেননি। বলেছিলেন, ‘‘নিবেদিতা আমার মেয়ে। ঠাকুরকে ভোগ রেঁধে নিবেদন করার অধিকার তার আছে। তার দেওয়া প্রসাদ পরমানন্দে কোনো দ্বিধা না রেখে আমি নেব। তাতে যদি কারও আপত্তি থাকে, সে নিজেকে নিয়েই থাক।’’ মাতৃস্নেহ দিয়ে জাত ধর্ম বর্ণের ব্যবধান তিনি মুছে দিয়েছিলেন। এক পল্লীরমণী হয়েও চিন্তার দিক থেকে তিনি ছিলেন অতি আধুনিকা। আর হবেন নাই-বা কেন! স্বয়ং ঠাকুর যে নিজে হাতে তাঁকে গড়েপিঠে নিয়েছিলেন।

মঠ মিশনের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী যারা মায়ের সান্নিধ্য লাভ করেছেন, তাঁরা মায়ের অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন। । জয়রামবাটিতে থাকতে ব্রহ্মচারী জ্ঞানের চর্মরোগ হয়েছিল। তিনি নিজে খেতে পারতেন না। মা প্রত্যহ নিজে হাতে ভাত মেখে তাকে খাইয়ে দিতেন। তার উচ্ছিষ্ট পাতা পর্যন্ত ফেলতেন। ব্রহ্মচারী রাসবিহারী একবার জয়রামবাটি থেকে পাশের গ্রামে গিয়ে দুপুরের আগে ফিরতে পারেননি। সূর্যাস্তের কিছু আগে ফিরে শুনলেন যে মা না খেয়ে তার জন্য বসে আছেন। তাঁর আহার করা শেষ

হবার পর তবেই মা খেলেন। এতটাই স্নেহশীলা ছিলেন তিনি।

ঠাকুরের নিষেধ অগ্রাহ্য করে মা বালক ও যুবক ভক্তদের জন্য ধার্য নৈশ আহারের পরিমাণের থেকে বেশি বেশি আহারের ব্যবস্থা করতেন। ঠাকুর এ নিয়ে অনুযোগ করলে মা দৃপ্তকণ্ঠে জানিয়ে দেন, ''আমার সন্তানদের নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না। ওদের ভবিষ্যৎ আমি দেখব।'' ঠাকুর সেদিনই বুঝেছিলেন সঙ্ঘজননী রূপে মায়ের জাগরণ হতে চলেছে। মা সেই দায়িত্ব পরবর্তীকালে সুনিপুণভাবে পালন করেছেন। সঙ্ঘজননী হিসেবে তিনি ছিলেন একাধারে মমতাময়ী ও কর্তৃত্বময়ী।

স্বয়ং বিবেকানন্দও মাকে অত্যন্ত মান্য করে চলতেন। মায়ের আদেশ তাঁর কাছে ছিল শিরোধার্য। একবার প্লেগ রোগের সেবাকার্যের জন্য আর্থিক সংগতি শেষ হয়ে যাওয়ার স্বামীজী মঠের জমি বিক্রি করে অর্থ জোগাড়ের কথা ভাবেন। মা সারদার হস্তক্ষেপে স্বামীজী ওই কাজ থেকে বিরত হন। আরেকবার এক উড়িয়া চাকরকে চুরি করার জন্য স্বামীজী মঠ থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। মা তখন বোসপাড়া লেনের বাড়িতে থাকেন। চাকরটি মা'র কাছে গিয়ে কেঁদেকেটে পড়ল। মা তাকে স্নান আহার করালেন। বিকালবেলায় স্বামী প্রেমানন্দ মঠ থেকে মাকে প্রণাম করতে এলেন। মা তখন ওই চাকরটিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বললেন। স্বামী প্রেমানন্দ তাঁকে সঙ্গে করে মঠে নিয়ে যেতে বিবেকানন্দ বলে উঠলেন, ''বাবুরামের কাণ্ড দেখ। ওটাকে আবার নিয়ে এসেছে।'' কিন্তু সমস্ত ঘটনা শোনার পর উনি প্রেমানন্দকে বা চাকরটিকে আর একটি কথাও বলেননি। এতটাই তিনি মাকে মান্য করতেন। তিনি মনে করতেন যে মায়ের আশীর্বাদেই আমেরিকায় সাফল্যলাভ সম্ভব হয়েছিল। স্বামী শিবানন্দকে চিঠিতে লিখেওছিলেন সেকথা।

মেয়েদের কীভাবে চলা উচিত তার একটি ধারণা মা দিয়ে গেছেন। কথায় কথায় তিনি রাধু, মাকু, নলিনীদের বলেছেন, ''আমি বলছি লজ্জা, ঘৃণা, ভয় তিন থাকতে হয়। যার আছে ভয় তার হয় জয় — বিশেষকরে মেয়েমানুষের।'' ভারতীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী লজ্জা নারীর ভূষণ। নারীর লজ্জা থাকাটাই বাঞ্ছনীয়। সেইসঙ্গে ঘৃণা থাকতে হবে। এই ঘৃণা হলো যা কিছু আদর্শবিরোধী, নীতিবিরোধী তার বিরুদ্ধে। আর ভয় হলো সম্মানহানির ভয়, লোকলজ্জার ভয়। প্রকৃতপক্ষে এই তিনটি বোধ থাকলেই নারী সুরক্ষিত থাকে। এখানেই মায়ের দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীমা সারদা ছিলেন সকলের মা। পশুপাখি, কীটপতঙ্গ সকলের জননী। পিঁপড়ে মারতে দেখলেও তিনি ব্যাকুল হতেন। তাঁর পোষা চন্দনাটি ডাকলেই খাবার নিয়ে ছুটে যেতেন। তাকে নিজে রোজ স্নান করাতেন, খাবার দিতেন। মায়ের অনুপস্থিতিতে তার পোষা বেড়ালগুলি যাতে অভুক্ত না থাকে তার জন্য জ্ঞানানন্দ মহারাজের প্রতি তাঁর বিশেষ নির্দেশ ছিল।

মায়ের মমতাময়ী সত্তার স্ফুরণ ঘটেছিল বাল্যকালেই। জয়রামবাটি অঞ্চলে একবার প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। মায়ের বাড়িতে পীড়িতদের জন্য অন্নসত্র খোলা হয়েছিল। বুভুক্ষু মানুষদের ক্ষুধা নিরসনের জন্য হাঁড়ি হাঁড়ি খিচুড়ি রান্না হতো আর একাদশ বর্ষীয়া বালিকা সারদা দুহাত দিয়ে গরম খিচুড়ি ঠাণ্ডা করার জন্য বাতাস করতেন।

মায়ের দিব্য মাতৃত্ব এরকম নানান ঘটনার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। নাট্যকার গিরিশ ঘোষকে মা একবার বলেছিলেন, ''আমি সত্যিকারের মা, গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়, সত্য – সত্য জননী।''

ঠিকই তো। একজন সত্যিকারের মায়ের যা যা গুণ থাকা দরকার সেই স্নেহ, মায়া, মমতা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, ত্যাগ, তিতিক্ষা, ক্ষমা, পবিত্রতা, সেবাপরায়ণতা — এই সব গুণই তাঁর মধ্যে বর্তমান ছিল। তিনি মানবতার মূর্ত প্রতীক, এক অনন্য মাতৃত্বের অধিকারিণী, সকলের মা— মা সারদা। □

প্রয়াগরাজ কুম্ভমেলা শিবির-২০২৫

ব্রহ্মচারী শ্রীহৃষীকেশ মহারাজজী দ্বারা পরিচালিত শিবশক্তি সেবাধাম প্রতি বছরের মতো আগামী ২০২৫ সালে প্রয়াগরাজ পূর্ণকুম্ভমেলাতে শিবিরের আয়োজন করতে চলেছে। শিবশক্তি সেবাধাম যেভাবে অন্যান্য কুম্ভমেলাতে তীর্থযাত্রীদের থাকা-খাওয়া, চিকিৎসা ও তীর্থভ্রমণের সুব্যবস্থা করে থাকে, সেভাবেই প্রয়াগরাজ কুম্ভমেলাতেও সমস্ত সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা থাকবে। শিবির ত্রিবেণী সঙ্গমের নিকট হওয়াতে পুণ্যস্নান সহজ হবে। শিবিরের সুবিধা গ্রহণে ইচ্ছুক তীর্থযাত্রীরা অগ্রিম বুকিং করুন। আসন সংখ্যা সীমিত। কুম্ভমেলায় সন্তভাণ্ডারা, ব্রাহ্মণভোজন ও সেবাদানের মতো পুণ্যকাজে দানধ্যান করতে ইচ্ছুক ভক্তরা নিম্নলিখিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দান করতে পারেন। বিস্তারিত জানতে ফোনেও যোগাযোগ করা যাবে।

Google Pay/ PhonePe No.- 9451268600

D.47/49,Ramapura.(Opposite of Mazda Cinema Carparking),
Varanasi (UP).

Mob. No. - **9451268600, 7985210182.**

Bank Account datails- Name— Hrishikesh Brahmachari.

A/C No - 34903180246. IFSC -SBIN0001190

State Bank of India (SBI), Varanasi, U.P.

বিঃ দ্রঃ- আধার কার্ড, পাসপোর্ট সাইজের দুটি ছবি এবং ১টি বিছানার চাদর সঙ্গে আনতে হবে।

মা-সারদার পোষ্য এবং পশুপ্রেম

সুতপা বসাক ভড়

যিনি 'সতের মা, অসতেরও মা', যিনি 'ভালোর মা, মন্দেরও মা' সেই জননী সারদামণির অমৃতসমান জীবনকথার বৈচিত্র্যময় ঘটনাধারায় বার বার দেখি তিনি যেমন সবলের মা, তেমনি দুর্বলেরও মা, আর্ত-পীড়িত-অবহেলিতের মা, আবার শোকে-দুঃখে জর্জরিত মানুষের জীবনে একমাত্র আশার আলো। তিনি বরাভয়দায়িনী জননী। দুঃখের আঁধার রাত্রি যাদের জীবনে অনন্ত বাস্তব, বঞ্চনার অভিঘাতে যন্ত্রণাবিদ্ধ জীবন যাঁদের, তাঁরাই এই 'সত্যিকারের মায়ের' কাছে পেতে পারেন নিরাপদ ও নির্ভয় আশ্রয়। শুধু সেদিন নয়, শুধু তাঁর সমকাল বা ক্ষণকালের মানুষই নয়, চিরকালের মানুষ সেই মাতৃত্বের জীবন- জাগনিয়া স্পর্শে বেঁচে উঠতে পারে, প্রাণ-মন সমর্পণ করে শুনতে পারে সেই শাশ্বত আশ্বাস : 'মনে ভাববে, আর কেউ না থাক, আমার একজন 'মা' আছেন। তাঁর এই আশীর্বাদ ধন্য ছিল জীব-জন্তু, পশু-পক্ষী সকলেই।

তেলোভেলোর মাঠে এক দস্যুদম্পতি সারদাদেবীকে কালীরূপে দেখেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র শিবরাম শ্রীমায়ের মুখেই শুনেছিলেন যে, শ্রীশ্রীমা স্বয়ং মা-কালী। জয়রামবাটীতে মায়ের বাড়িতে একটি বিড়াল ছিল। ব্রহ্মচারী জ্ঞান তখন মায়ের সেবক; তিনি বিড়ালটিকে আদর-যত্ন করতেনই না, বরং মাঝে মাঝে একটু-আধটু প্রহার করতেন। মা তা জানতেন। ইতিমধ্যে জ্ঞান মহারাজের অযত্ন সত্ত্বেও রাধু ও শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহে বিড়ালের বংশবৃদ্ধি হয়েছিল।

একবার কলকাতা আসার সময় ব্রহ্মচারী জ্ঞানকে ডেকে মা বললেন--- 'জ্ঞান, বেড়ালগুলোর জন্যে চাল নেবে; যেন কারও বাড়ি না যায়— গাল দেবে, বাবা।' তারপর ভাবলেন, শুধু এইটুকু বলায় বিড়ালের ভাগ্য ফিরবে না; তাই আবার বললেন, 'দেখ জ্ঞান, 'বেড়ালগুলোকে মেরো না। ওদের ভেতরেও তো আমি আছি।' —'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা', তিনিই যে আমাদের শ্রীশ্রীমা হয়ে এসেছেন, নিজের এই পরিচয় নিজেই দিয়ে গেলেন : আমি মাতৃরূপে সর্বভূতে, এমনকী এই বিড়ালগুলোর ভেতরও রয়েছি। একবার এক মহিলাকে বেড়ালের মাথায় পা দিয়ে আদর করতে দেখে মা ধমক দিয়ে বলেছিলেন, ওকি করছ। মাথায় যে ব্রহ্ম থাকেন। ওভাবে কারও মাথায় পা দিতে নেই। ওকে প্রণাম করো।

আবার শ্রীশ্রীমার কথায় জানতে পারি, 'ছেলেবেলায় গলাসমান জলে নেমে গোরুর জন্য দলঘাস কেটেছি।' পোষা চন্দনা 'গঙ্গারাম' সকলের মতো তাঁকে ডাকত— 'মা-ওমা'। মা-ও উত্তর দিতেন, 'যাই বাবা যাই', এই বলে পাখিকে ছোলা-জল দিয়ে আসতেন। কারণ পাখির মাতৃ-সম্বোধনের অর্থই হলো, তার খিদে পেয়েছে। বিড়াল মায়ের স্নেহযত্নে বংশবৃদ্ধি করত নির্ভয়ে। অন্যেরা তাদের দৌরাত্ম্যে বিরক্ত। তাদের খুশি করতে মা মাঝে মাঝে ছদ্ম কোপে লাঠি তুলে নিতেন হাতে। কিন্তু ভীত বিড়ালটি আশ্রয় নিত মায়েরই পায়ে। মা-ও সঙ্গে সঙ্গে লাঠি ফেলে দিতেন। জয়রামবাটীতে দেখা যেত, বাছুরের হাম্বা হাম্বা ডাকে মা ছুটে গিয়ে তার বন্ধন মোচন করছেন, কখনও-বা যন্ত্রণাকাতর বাছুরটিকে দু-হাতে জড়িয়ে তার ব্যথার স্থান আরাম করছেন। জনৈক সাধু যখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তুমি কি সকলেরই মা? ...এইসব ইতর জীবজন্তুরও?' — মা উত্তর দিয়েছিলেন, 'হ্যাঁ ওদেরও'।

শ্রীশ্রীমায়ের মাতৃত্বের মধ্যে আমরা যে বৈশিষ্ট্যগুলি দেখলাম, সেই স্নেহ, প্রেম, উদারতা-অদোষদর্শিতা প্রভৃতির সমষ্টিগত বিকাশ সত্যই বিরল। স্বরূপত সারদাদেবী আদ্যাশক্তি। জগন্মাতার মানবীরূপ। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মাতৃসাধক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেই আদি জননীর চরণে সমর্পণ করেছিলেন তাঁর জপের মালা, সাধনার সব ফল। সেজন্য কোনো লৌকিক মাতৃত্ব এই অপার্থিব ঈশ্বরীয় মাতৃত্বের তুলনা হতে পারে না। এই সজীব জগজ্জননী পাগলিমাসির মুখে 'সর্বনাশী' অপবাদ শুনে 'পৃথিবীর মতো সহ্যশীলা' মা-ও প্রতিবাদ করে বলেছিলেন— 'আর যা বলিস, আমার সর্বনাশী বলিসনে; জগৎ জুড়ে আমার ছেলেরা রয়েছে, তাদের অকল্যাণ হবে।'

তথ্যসূত্র :

শ্রীশ্রীমায়ের কথা, প্রথম ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, দ্বাদশ সংস্করণ (১৩৮৭), পৃ. ৯৯।
শ্রীমা সারদা দেবী, পৃ. ৪০৮। শ্রীমা সারদা দেবী, পৃ. ৩৯২। শ্রীশ্রীমায়ের কথা, প্রথম ভাগ, পৃ. ১৮২। শ্রীশ্রীমায়ের কথা, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ৪। শ্রীমা সারদা দেবী। শতরূপে সারদা।

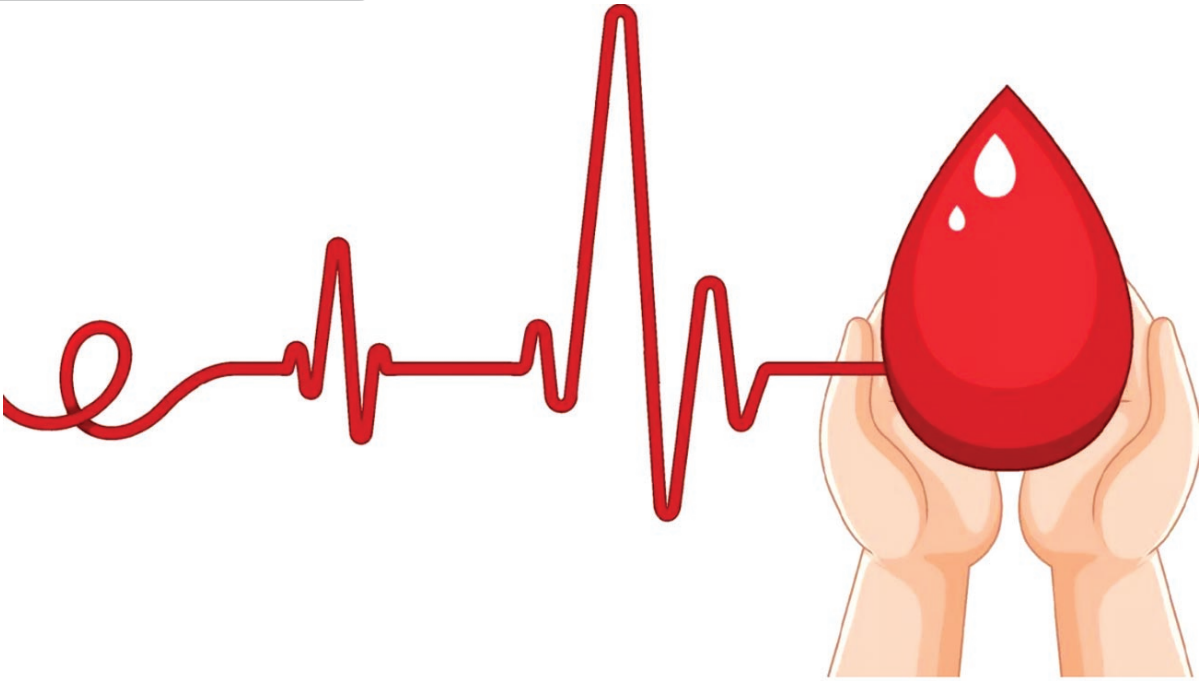

কারা রক্তদান করতে পারবেন না

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

রক্তদান হলো জীবন দান। কিন্তু সবাই রক্তদান করতে পারবে না।

১. কুকুরের কামড়ের ইঞ্জেকশন যাঁরা নিয়েছেন তাঁরা ইঞ্জেকশনের কোর্স শেষ হওয়ার পর এক বছর রক্তদান করবেন না।

২. বড়ো অপারেশন যাঁদের হয়েছে তাঁরা ২ বছর পর্যন্ত রক্তদান করবেন না। ছোটো অপারেশন হলে ছয় মাস পর্যন্ত রক্তদান অনুচিত।

৩. কোনও কারণে কেউ যদি রক্ত গ্রহণ করে থাকেন, তাহলে তিনিও একবছর পর্যন্ত রক্তদান করতে পারবেন না।

৪. জন্ডিস, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড হলে সুস্থ হওয়ার ছ'মাস রক্তদান করবেন না।

৫. যাঁরা হাসপাতালে গিয়ে দাঁত তুলেছেন, নাকে বা কানে ফুটো করিয়েছেন বা শরীরে উলকি করিয়েছেন, তাঁরা ছ' মাস রক্তদান করতে পারবেন না।

৬. গত ছ' মাসের মধ্যে যেসব মহিলার গর্ভপাত হয়েছে বা যিনি বর্তমানে সন্তানসম্ভবা, তিনিও রক্তদান করতে পারবেন না।

৭. যে মহিলার সন্তান এখনও মাতৃদুগ্ধ পান করে, তিনি রক্তদান করবেন না।

৮. যেসব মহিলা ঋতুচক্রের মধ্যে আছেন তিনি রক্তদান করবেন না।

৯. যাঁর কোনও চর্মরোগ বা যৌনরোগ আছে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার পরেও ছ' মাস রক্তদান করবেন না।

১০. যে ব্যক্তির অ্যান্টিবায়োটিক চলছে, কোর্স শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি রক্তদান করবেন না।

১১. যিনি গত ১২ ঘণ্টার মধ্যে মদ্যপান করেছেন তিনি রক্তদান করবেন না। কোনো ব্যক্তি যদি নিয়মিত অ্যালকোহল নেন, তিনি রক্তদান করার অধিকারী নন।

১২. যে ব্যক্তি একাধিক সঙ্গীর সঙ্গে যৌনসংসর্গে অভ্যস্ত, তাঁর কাছ থেকে রক্ত গ্রহণ করা অনুচিত।

১৩. মানসিকভাবে অবসাদগ্রস্ত ব্যক্তি বা মানসিক রোগীদের কাছ থেকে রক্ত গ্রহণ করা উচিত নয়।

১৪. একবার রক্তদান করার পর পুরুষদের ক্ষেত্রে ৯০ দিন এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ১২০ দিনের মধ্যে আর রক্তদান করা অনুচিত। সিঙ্গল ডোনার প্লেটলেটের ক্ষেত্রে সর্বাধিক একটি সপ্তাহে দুবার এবং একটি বছরে সর্বোচ্চ ২৪ বার রক্তদান করা যাবে। উপযুক্ত নির্দেশিকার বাইরেও কিছু কিছু প্রশ্ন থাকতেই পারে। প্রতিটি রক্তদানের সময় একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক উপস্থিত থাকেন। প্রশ্ন ও সংশয়ের কথা সেই চিকিৎসকের কাছে সরাসরি জিজ্ঞেস করতে হবে। □

মা সারদার দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ

পারুল মণ্ডল সিংহ

মা, তুমি পৃথিবীর মা, তোমার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের মা তত্ত্বই প্রকাশিত হবে'— কথাগুলি শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সহধর্মিণী সারদামণিকে বলেছিলেন। এই কথাগুলি শুধুমাত্র তাঁর সহধর্মিণীর প্রতি শ্রদ্ধাই নয়, বরং গভীর মর্যাদার পরিচায়ক। সারদামণির মধ্যে যে শাশ্বত শক্তি রয়েছে, তা শ্রীরামকৃষ্ণ আগে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই পরবর্তীকালে গোটা বিশ্ব তাকে মা সারদা বলেই চিনেছে।

তবে মা সারদার পরিপূর্ণতা এসেছিল শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথিতে কথিত, শিহড়ে মায়ের মামার বাড়িতে একদিন হৃদয়ের গৃহে সংগীতানুষ্ঠান চলাকালীন এক আত্মীয়া বালিকা সারদাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'এই যে এত লোক এখানে রয়েছে, এদের মধ্যে কাকে তোর বিয়ে করতে সাধ যায়?' অমনি বালিকা সারদা অদূরে উপবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিয়ে দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণও একই দৈব নির্দেশ তাঁর পরিবারের সামনে তুলে ধরলেন। পরিবারের পক্ষ থেকে তার জন্য পাত্রী সন্ধান করা হচ্ছে শুনে বালকসুলভ আনন্দ ও উৎসাহ প্রকাশ করে বললেন— 'জয়রামবাটীর রামচন্দ্র মুখুজ্জের বাড়িতে দেখগে, সেখানে কুটো বাঁধা আছে।' বলাবাহুল্য, মা সারদার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের বিবাহ ঐশ্বরিক উদ্দেশ্যেই সম্পন্ন হয়েছিল।

বিয়ের পর তিনি আঠারো বছর বয়সে পাকাপাকি ভাবে দক্ষিণেশ্বরে মন্দিরের যান স্বামী শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাংসারিক জীবন অতিবাহিত করার জন্য। সারদার মধ্যে এমন একটি আধ্যাত্মিক গভীরতা ছিল যা শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন পথে অগ্রসর হতে সহায়তা করেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ মা সারদাকে শুধু একজন সাধিকা ও জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মা সারদাকে শিখিয়েছিলেন, এই পৃথিবীতে শুধু বাহ্যিক সম্পর্কই নয়, আধ্যাত্মিক একত্ব ও সত্তার গভীর উপলব্ধি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মা সারদা শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে একাধারে জীবন দর্শন ও ধর্মের আসল মূল্যবোধ গ্রহণ করেন। ধীরে ধীরে মা সারদামণি হয়ে ওঠেন শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক সহচরী ও শিষ্যা। মা সারদা শ্রীরামকৃষ্ণকে আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবেই দেখতেন। দক্ষিণেশ্বরে এসে মা সারদা স্বামী শ্রীরামকৃষ্ণের সেবার ভার নিজের হাতে তুলে নেওয়ার পর বারবার শ্রীরামকৃষ্ণের দৈবলীলার সাক্ষাৎ পান। এই সময় একদিন মা সারদা মা ভবতারিণীর জন্য জুই আর রঙ্গন ফুল দিয়ে একটি মালা গেঁথে দিলেন। মালাখানি শ্রীরামকৃষ্ণের হাতে গিয়ে পৌঁছালে তিনি দেবীর গলায় পরিয়ে দিলেন এবং সেবিকা বৃন্দাকে বললেন 'যা তো মালাখানি যে গেঁথেছে তাকে ডেকে আন, সে দেখে যাক মালাখানি পরে মাকে কেমন দেখাচ্ছে।' নির্দেশ পেয়ে মা সারদা মন্দিরে এসে শ্যামামায়ের সামনে দাঁড়াতেই তার এক অদ্ভুত দর্শন হলো। তিনি দেখলেন শ্যামামায়ের মুখের উপর শ্রীরামকৃষ্ণের মুখখানি অবিকল আঁকা। এবং পরনে সদ্য তারই হাতে গাঁথা জুঁই ফুলের মালাখানি। এই দৈব দর্শনের পর তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে শ্যামা মা ও ঠাকুরের মধ্যে প্রকৃতই কোনো ভেদ নেই। মা ভবতারিণীর মধ্যেই ঠাকুর অবস্থান করেন এবং তার হৃদয়ের মধ্যেই মা ভবতারিণী বিরাজিতা। এমনই আরেকদিন জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যা তিথিতে আর এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটল। দেবীর আসনে যিনি উপবিষ্ট, আর সাধকের আসনে যিনি ধ্যানমগ্ন, তাঁরা ব্যক্তিগত সম্পর্কে পত্নী ও পতি। ভারতের ধর্মসাধনার ইতিহাসের এই প্রোজ্জ্বল মুহূর্ত এসেছিল ফলহারিণী কালীপূজার দিনে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মা সারদাকে আধ্যাত্মিক জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দান করেন। এগুলির মধ্যে প্রধান ছিল জপ ও ধ্যানের নির্দেশিকা। তিনি এতটাই নিঃশব্দে ও অলক্ষিত হয়ে বাস করতেন যে মন্দিরের ম্যানেজার একবার বলেছিলেন, 'আমরা জানতাম তিনি এখানে বাস করেন। কিন্তু কোনোদিন চোখে দেখিনি'। শ্রীরামকৃষ্ণ দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছিলেন যে তার আধ্যাত্মিক প্রচারকার্য পরবর্তীকালে চালিয়ে নিয়ে যাবেন সারদা দেবী। সেই কারণে তিনি তাকে মন্ত্রশিক্ষা দেন এবং মানুষকে দীক্ষিত করে আধ্যাত্মিক পথে পরিচালিত করতে পারার শিক্ষাও দান করেন। শেষ জীবনে যখন শ্রীরামকৃষ্ণ গলায় ক্যানসারে আক্রান্ত তখন মা সারদাই স্বামীর সেবা এবং স্বামী ও তার শিষ্যদের জন্য রন্ধনকার্য করতেন। ১৮৮৬ সালের আগস্ট মাসে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবসানের পর বৈধব্যের চিহ্ন হিসেবে হাতের বালা খুলে ফেলতে গেলে তিনি স্বামীর দিব্যদর্শন পান। এই দর্শনে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলেন, তিনি মারা যাননি, কেবল এক ঘর থেকে আর এক ঘরে গেছেন। সারদা দেবী বলেছিলেন, যতবারই তিনি বিধবার বেশ ধারণ করতে গিয়েছিলেন, ততবারই দিব্যদর্শনে শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে নিরস্ত করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক উচ্চতার প্রতি গভীর বিশ্বাসের মাধ্যমে সারদা দেবী জীবনে এক উচ্চতম আধ্যাত্মিক স্তরে পৌঁছেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার মাধ্যমে তিনি তার ভক্তিকে পরিশুদ্ধ করে নিয়েছিলেন। তিনি প্রকৃতই বিশ্বাস করতেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে সকল দেবতা ও ঈশ্বরের আবির্ভাব ঘটেছে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে দৈব নির্দেশেই তাকে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গিনী রূপে পাঠানো হয়েছে।

শ্রীশ্রীমা সারদা এবং তাঁর আদরের খুকি

নিবেদিতা কর

পাশ্চাত্যনারী মার্গারেট নোবেল যাতে ভারতীয় নারী-আদর্শের মধ্যে নবজন্ম গ্রহণ করতে পারেন সেজন্য স্বামীজী তাঁকে এনে সমর্পণ করেছিলেন ওই আদর্শের পরাকাষ্ঠা এক পরমা মাতৃমূর্তির পদতলে। তিনি আর কেউ নন— জননী সারদাদেবী। যিনি নিজেকে দাবি করেছিলেন মানব জাতির মা; 'সত্যিকারের মা; গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়— সত্য জননী' হিসেবে।

১৮৯৮ সালের ১৭ মার্চ বাগবাজার ১০/২ নং বোসপাড়া লেনের বাড়ি। অন্দরে মা অধিষ্ঠিতা। প্রায় ঘোমটার আড়ালেই ঢাকা থাকত তাঁর মুখ। কিন্তু রক্ষণশীলতার শিকলে কখনও আটকা পড়েনি মন। প্রথমবার বাগবাজারের বাড়িতে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় তাঁর বুক দুরুদুরু করছিল। মা তখন শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের চালিকাশক্তি।

সে যুগে হিন্দু বিধবা কিনা ভিনদেশির সান্নিধ্যে আসবে! সবাইকে অবাক করে মা সেদিন মিষ্টি জল খেলেন তাঁদের সঙ্গে বসেই। কেউ কারও ভাষা জানেন না। অথচ নয়নে নয়নে কথোপকথন যে কত সুদৃঢ় বন্ধন গড়ে দিতে পারে তার প্রমাণ এই মা-মেয়ের সম্পর্ক। দুই ভিন ভাষার মানুষের মধ্যে প্রথম কথা বলেছিলেন নিবেদিতাই। মৌনতা ভেঙে তিনি বলে উঠেছিলেন 'কী যে অপরূপ দেখতে'! মা মৃদু হেসেছিলেন। সেদিনের সেই সাক্ষাতে স্বামীজী যতটা মুগ্ধ হয়েছিলেন, ততটাই স্বস্তি পেয়েছিলেন নিবেদিতাকে এভাবে মা গ্রহণ করেছেন দেখে। মার্গারেটের ভাষায় সেই দিনটি ছিল 'Day of days'। পরে একদিন বলেন নিবেদিতা বলেছিলেন 'মা আমরাও বাঙ্গালি, কর্মের ফেরে খ্রিস্টান হয়ে জন্মেছি'।

নিবেদিতা ও সারদাদেবীর সম্পর্কের কথা বলতে গেলে অবশ্যই এসে পড়বে নিবেদিতা স্কুলের প্রসঙ্গ। নারীমুক্তি আন্দোলন ঘটাতে গেলে প্রথমেই শিক্ষার আলো দেখাতে হবে। তাই স্বামীজী ও নিবেদিতার প্রথম স্বপ্ন ছিল মেয়েদের একটি স্কুল স্থাপন। যেখানে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান, বিচারবুদ্ধির সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া গিয়েছিল প্রাচ্যের সংস্কার ও ভাবাদর্শ। এই বিদ্যালয়ের প্রাণপ্রতিষ্ঠাও করেছিলেন মা সারদা। বলেছিলেন, আমি প্রার্থনা করছি, যেন এই বিদ্যালয়ের উপর জগন্মাতার আশীর্বাদ বর্ষিত হয় এবং এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েরা যেন আদর্শ বালিকা হয়ে ওঠে।

নিবেদিতার স্কুলটি মা সারদার বাড়ির কাছে হওয়ায় তিনি প্রায়ই মায়ের সাক্ষাতে যেতেন ছাত্রীদের নিয়ে। কারণ তাঁর ভাবের নদীটিই তিনি ছাত্রীদের মধ্যে বইয়ে দিতে চেয়েছিলেন। মায়ের কাছে সিস্টার ছিলেন একেবারে ছোট্ট এক বালিকা। মায়ের মুখপানে চেয়ে থাকতেন পাঁচ বছরের শিশুর মতো। মাকে আসন পেতে দিয়ে বারবার তাতে চুম্বন করতেন আহ্লাদি মেয়ের মতো। নিবেদিতা বালিকার মতো আমোদ ও কৌতুকপ্রিয় ছিলেন। একদিন তিনি নিজে থাবা গেড়ে মেঝেতে চতুষ্পদ সিংহ হয়ে গেলেন এবং পিঠের উপরে লক্ষ্মী দেবীকে চাপিয়ে জগদ্ধাত্রী বানালেন মুখে ঠিক সিংহের মতো তর্জন গর্জন করতে লাগলেন। তা দেখে শ্রীশ্রীমা ও অন্যান্য সকলে হেসে লুটোপুটি, এমনই মধুর ছিল মা ও মেয়ের সম্পর্ক।

নিবেদিতা রাতে যখন মাকে দেখতে যেতেন তখন চোখে আলো লাগবে বলে আলোর উপর কাগজ লাগিয়ে দিতেন, পাছে মায়ের চোখে কষ্ট হয়। মাকে প্রণাম করার সময় নিবেদিতা একটা কাপড় নিয়ে আলতো করে মায়ের পা মুছিয়ে

নিজের মাথায় ঠেকাতেন। মায়ের পায়ে বাত, সিঁড়ি ভাঙতে কষ্ট। নিবেদিতা থাকলে মাকে কোলে করে দোতলায় তুলে দিতেন। তখন যেন নিবেদিতাই মা আর শ্রীশ্রীমা তার কন্যা। ব্যাপারটা সহজ হতো কারণ মায়ের ভিতর স্বাভাবিক বালিকাভাব ছিলই। আনন্দের তৃপ্তিতে নিবেদিতা ডগমগ হতেন। পরবর্তীতে নিবেদিতা মাকে যত দেখেছেন তত মুগ্ধ হয়েছেন। এক পল্লীগ্রামের বধূ হয়েও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের কত কঠিন সমস্যাও তিনি সামলে দিতেন। রামকৃষ্ণ অনুগামীদের মধ্যেও কোনো বিরোধ বা সংশয় হলে তিনি দূর করে দিতেন বিচক্ষণতায়। তাই তো তিনি সঙ্ঘজননী। একসময় নিবেদিতার মনে প্রশ্ন জেগেছে, সারদাদেবী কি পুরাতন আদর্শের শেষ প্রতিনিধি নাকি নতুন আদর্শের অগ্রদূত? তাঁর মনের এই প্রশ্নের উত্তরগুলি যদিও পরে তিনি মায়ের বিভিন্ন কার্যকলাপের মাধ্যমে পেয়ে গিয়েছিলেন। যেমন একদিকে যখন রক্ষণশীল সমাজের একাংশ তাঁর ছোঁয়া এড়াতে ব্যস্ত, তখন মা সারদা তাঁকে ঠাকুরের ভোগ রান্না করারও অধিকার দিয়েছেন। তা নিয়ে নারীমহলে ফিসফাস হলেও তা গ্রাহ্য করেননি তিনি। বরং বলেছেন, 'নিবেদিতা আমার মেয়ে, ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করার অধিকার তার আছে।'

মায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রতিটা দিন নিবেদিতা তাঁর খাতায় লিখে রাখতেন আর মাও অতি যত্নে নিবেদিতার দেওয়া প্রতিটি উপহার আগলে রাখতেন। তা সে জার্মান সিলভারের কৌটোই হোক বা এন্ডির চাদর। তা ছিঁড়ে গেলেও তিনি ফেলেননি। বলতেন, ওটা দেখলেই নিবেদিতার কথা মনে পড়ে। এমনই ছিল টান। নিবেদিতার প্রতিও শ্রীশ্রীমার স্নেহ নানাভাবে প্রকাশ পেত। একদিন নিবেদিতা এসে প্রণাম করে বসলেন, মা কুশল প্রশ্নের পর একখানি ছোটো পশমের তৈরি পাখা তাকে দিয়ে বললেন, 'আমি এখানি তোমার জন্য করেছি।' নিবেদিতা উহা পাইয়া আনন্দে অধীর, একবার মাথায় ঠেকান, একবার বুকে রাখেন। আর বলেন, কী সুন্দর কী চমৎকার!' কী একটা সামান্য জিনিস পেয়ে ওর আহ্লাদ দেখেছ! আহা, কী সরল বিশ্বাস! যেন সাক্ষাৎ দেবী। একদিন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানি নিবেদিতার কপালে সিঁদুরের টিপ দিয়েছিলেন। নিবেদিতাকে তাতে ভারী সুন্দর আর উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। শ্রীমা খুব খুশি হলেন। পাঁচ বছরের মেয়েকে যেমন চুমু খায় তেমনি চুমু খেয়ে আদর করলেন। তিনি নিবেদিতাকে গভীর, অতি গভীরভাবে ভালোবাসতেন।' আমার প্রাণের সরস্বতী' বলে প্রায়ই ডাকতেন। নিবেদিতাও মায়ের আদরে গলে যেতেন।

সারদামায়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের অল্পদিন পরে মিসেস র‍্যাটক্লিফের মতো সমাজবিজ্ঞানীকে (স্টেটসম্যানের এককালীন সম্পাদিকা) ২২ মে, ১৮৯৮ তারিখের চিঠিতে নিবেদিতা, মায়ের বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে শেষে লেখেন 'তিনি অনাড়ম্বর সহজতম সাজে পরম শক্তিময়ী মহত্তমা এক নারী।' পরে র‍্যাটক্লিফ যখন সন্তানসম্ভবা, তখন ২ সেপ্টেম্বর, ১৯০৩ তারিখের চিঠিতে লিখেছিলেন— জন্মাবার পরে তিনি ওই সন্তানটিকে নিয়ে যাবেন সারদাদেবীর কাছে, যিনি আপাতদৃষ্টিতে খুব সাদাসিধে হিন্দু রমণী, আমার ধারণায় বর্তমান পৃথিবীর মহৎ নারী। দুই পত্রের মধ্যে ব্যবধান কিছু বেশি, পাঁচ বছর। এই সময়ের মধ্যে নিবেদিতা সারদাদেবী সম্পর্কে 'One of the greatest' থেকে 'The greatest'— এই ধারণায় পৌঁছে গেছেন— পত্রের সাক্ষ্য তাই বলে। যদিও পত্রসাক্ষ্যে আমরা পাঁচ বছর ব্যবধান পাই, বস্তুত পক্ষে অনেক তিনি ওই ধারণায় উপনীত হয়েছিলেন।

১৯০৪ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি শ্রীশ্রীমা কলকাতায় আসেন, ২৪ ফেব্রুয়ারি নিবেদিতা তাঁর থেকে আশীর্বাদ লাভ করে ধন্য হন। ওইদিন মিস ম্যাকলাউডকে এক পত্রে লেখেন, 'মাতাদেবী এখানে রহিয়াছেন, কী রকম ছোটো, রোগা ও কালো হইয়া গিয়োছেন। পল্লীজীবনের কঠোরতাই তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণ। তাঁকে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখার জন্য কত জিনিস যে দিতে ইচ্ছে করে। তাঁকে একখানি সুন্দর ছবি দিই। বস্তুত শ্রীমাকে নানা জিনিস উপহার দেওয়ার প্রবল বাসনা নিবেদিতার হৃদয়ে জাগ্রত। মা যখন পূজায় বসতেন নিবেদিতা মুগ্ধ হতেন। এই প্রসঙ্গে ১৯০৫ সালের ৮ মার্চ, তিনি তার ডায়েরিতে লিখেছিলেন, 'শ্রীশ্রীমা যখন পূজা করিতে বসেন তাঁহাকে কী সুন্দর দেখায়! সেই মুহূর্তে আমি তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা ভালোবাসি।'

মিসেস বুলের অসুস্থতার সংবাদে যখন নিবেদিতার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন তখন নিবেদিতা শ্রীশ্রীমার আশীর্বাণী মিসেস বুলকে পাঠিয়েছিলেন। নিবেদিতা বিদেশে গেলে শ্রীশ্রীমা কাঁদতেন। আক্ষেপ করে বলেছিলেন, যে হয় সুপ্রাণী তার জন্য কাঁদে মহাপ্রাণী। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর বস্টনে নিবেদিতা মিসেস বুলের অসুস্থতার আরোগ্য কামনার জন্য গির্জায় প্রার্থনা করতে যান। ফিরে এসে তাঁর ডায়েরিতে লেখেন, সারদাদেবীকে আমাদের মেরিমাতা বলে মনে হলো।

১৯১১ সালে বুলের দেহাবসানের পর দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করে শ্রীশ্রীমা প্রত্যাবর্তন করেন ১১ এপ্রিল। সেবার মাত্র কয়েকদিন সেখানে থেকে তিনি চলে যাবেন জয়রামবাটি। প্রথম দিনেই শোকার্ত হৃদয়ে নিবেদিতা শ্রীশ্রীমায়ের সান্ত্বনা লাভ করলেন। যে কদিন শ্রীশ্রীমা বাগবাজারে ছিলেন নিবেদিতা প্রতিদিন তাঁর পবিত্র সঙ্গলাভের জন্য সেখানে যেতেন। গ্রীষ্মাবকাশে মায়াবতী যাওয়ার আগে নিবেদিতা শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করলেন। শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে এই ছিল তাঁর শেষ সাক্ষাৎ।

স্বামীজীর দেহাবসানের পর থেকে নিবেদিতা ক্রমশই মায়ের অতি ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। মা তো তার অতলান্তিক মাতৃহৃদয় নিয়ে শান্তির আঁচলখানি বিছিয়ে বসেছিলেনই। নিবেদিতা শ্রীশ্রীমাকে এতটাই ভালোবেসেছিলেন যে তার নিজের গর্ভধারিণী জননীকে 'লিটিল মাদার' বলে উল্লেখ করতেন। নিবেদিতা নিজেই প্রথমে বুঝতে পারেননি কখন মায়ের 'আদরের খুকি' হয়ে গিয়েছেন কখন মায়ের মেয়ে, বঙ্গজননীর মায়ের মেয়ে, ভারতমাতার মেয়ে হয়ে গেলেন।

তথ্যসূত্র :
'আমি এই দেশেরই মেয়ে'—মৃদুলকান্তি ধর।
'ভগিনী নিবেদিতা'— প্রব্রজিকা মুক্তিপ্রাণা।
'ভারত উপাসিকা নিবেদিতা'— রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংস্কার ভারতী এবং ভারতীয় সংস্কৃতি ন্যাসের উদ্যোগে নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ বঙ্গ নাট্যমেলা

গত ২২ নভেম্বর সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ (দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত)-এর উদ্যোগে এবং ভারতীয় সংস্কৃতি ন্যাসের সহযোগিতায় পশ্চিম বর্ধমান জেলার পানাগড়ের নিকটবর্তী 'তেপান্তর নাট্যগ্রাম'-এর ব্ল্যাকবক্স থিয়েটারে আয়োজিত হয় দু'দিন ব্যাপী 'নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ বঙ্গ নাট্যমেলা'। প্রথম দিন নাট্যোৎসবের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট নাট্য নির্দেশক কল্লোল ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ (দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত)-এর কার্যকরী সভাপতি সুভাষ ভট্টাচার্য এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক সারদাপ্রসাদ পাল। সংস্কার ভারতীর অখিল ভারতীয় সম্পাদিকা নীলাঞ্জনা রায় নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন এবং প্রদীপ প্রজ্বলন করে নাট্যোৎসবের শুভ সূচনা করেন। প্রথম দিনের নাট্যমেলায় 'বঙ্গীয় নাটক এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষের অবদান' বিষয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন নাট্যকার ও নির্দেশক কল্লোল ভট্টাচার্য। নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষের স্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত প্রথম বঙ্গ নাট্যমেলারও আয়োজন করা হয় সাত কাহনিয়ার তেপান্তর নাট্যগ্রামে। 'এবং আমরা' নাট্য দলের নতুন নাট্য প্রযোজনা 'একটি ভালোবাসার গল্প' অভিনয়ের মধ্য দিয়ে এই নাট্যমেলার উদ্বোধন হয়।

'একটি ভালোবাসার গল্প' নাটকটি জনজাতি সমাজের একটি প্রচলিত লোককথাকে অবলম্বন করে নির্মিত হয়েছে। গল্পটি সাঁওতাল সম্প্রদায়ের লোককথা কিন্তু গল্পের আবেদন সমকালীন ও সর্বজনীন। মানুষের সঙ্গে মানুষের ভালোবাসা এবং প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের ভালোবাসাকে রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে নাটকটিতে। গাছপালা, পশুপাখি, প্রকৃতি— এই সবকিছুকে রক্ষা করা, তাদের ভালোবাসার মধ্যেই রয়েছে মানুষের ভালো ভাবে বেঁচে থাকার আসল রহস্য, এই কথাটিই বলা হয়েছে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের লোককথা অবলম্বনে নির্মিত 'একটি ভালোবাসার গল্প' নাট্য প্রযোজনাটিতে।

এদিনই নাট্যমেলার উদ্বোধন সত্রে সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গের নতুন প্রযোজনা 'কেন চেয়ে আছো গো মা' নাটকটির নামাঙ্কন প্রকাশ হয়। সংস্কার ভারতীর নতুন প্রযোজনা অনামি বিপ্লবী ননীবালা দেবীকে কেন্দ্র করে। আগামী তিনমাসের মধ্যে এই নাটক পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দেখতে পাবেন বলে ঘোষণা করেন নাট্য নির্দেশক অমিত দে। তিনি বলেন,"ননীবালা দেবী ভারতবর্ষের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বঙ্গের প্রথম মহিলা রাজবন্দি। তিনি ছিলেন অগ্নিযুগের ঐতিহাসিক 'যুগান্তর' বিপ্লবী দলের অন্যতম একনিষ্ঠ কর্মী। তাঁর লৌহসম দৃঢ় ব্যক্তিত্ব ব্রিটিশ পুলিশের ভিত নড়িয়ে দিয়েছিল। আজকের যুগে দাঁড়িয়েও আমরা শিহরিত হই ননীবালা দেবীর উপরে পুলিশের অকথ্য, পাশবিক নির্যাতনের কথা শুনে। জেলে বন্দি থাকাকালীন তাঁর পুলিশ অফিসারকে সজোরে চড় মারার অতিবিরল ঘটনাটিও আমাদের চমকিত করে। তবু তিনি উপেক্ষিতা।

আত্মীয়-পরিজন, সংসার, সমাজের আড়ালে তিনি একাকিনী, অসহায়, অথচ প্রবল আত্মমর্যাদাজ্ঞানসম্পন্না এক মহীয়সী নারী। তাই দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে অসুস্থ অবস্থাতেও সরকারি পেনশন নিতে তিনি অস্বীকার করেছিলেন। তাঁর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে সংস্কার ভারতীর নাট্য নিবেদন— 'কেন চেয়ে আছো গো মা'।"

বঙ্গ নাট্যমেলা সম্পর্কে সংস্কার ভারতীর দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সাধারণ সম্পাদক তিলক সেনগুপ্ত বলেন, 'ভারতে নাটক অত্যন্ত প্রাচীন কাল থেকেই জনপ্রিয়। ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র সে কথা প্রমাণ করে। আধুনিক সময়ে বঙ্গের নাটককে বিশেষভাবে জনপ্রিয় করে তোলেন নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ। 'থ্যাটারে (থিয়েটারে) লোকশিক্ষে হয়' বলে শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব মন্তব্য করেছিলেন। তিনি নিজে গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটক দেখেছিলেন। বঙ্গের 'কুনাট্য' দেখে কবি মধুসূদন দত্ত নিজেও দুঃখ পেয়ে নাটক রচনা করেছিলেন। সেই নাট্যশিল্পকে বিশেষ ভাবে জনপ্রিয় এবং দেশাত্মবোধ জাগরণের আধার করে তোলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং তাঁর ন্যাশনাল থিয়েটার। আমরা সেই মহান ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা জানাতেই আয়োজন করেছি 'নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ বঙ্গ নাট্যমেলা'র এবং প্রতিবছর পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এই নাট্যমেলার আয়োজন করা হবে।'

সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাস প্রভুর মুক্তির দাবিতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রতিবাদ সভা

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর পৈশাচিক অত্যাচারের প্রতিবাদে এবং ইসকন সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাস প্রভুর নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে গত ২ ডিসেম্বর বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরঙ্গ দল (কলকাতা মহানগর)-এর উদ্যোগে উত্তর কলকাতার শ্যামবাজার মেট্রো রেলস্টশনের ১ নম্বর গেটের কাছে আয়োজিত হয় একটি প্রতিবাদ সভা। সভামঞ্চে উপস্থিত ছিলেন যোগী আনন্দনাথ মহারাজ, যোগী মৃত্যুঞ্জয়নাথ মহারাজ এবং ধ্যানব্রতানন্দ গিরি মহারাজ। সভায় বক্তব্য রাখেন যোগী আনন্দনাথ মহারাজ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সংগঠন সম্পাদক মানিকচন্দ্র পাল, বজরঙ্গ দলের পূর্বক্ষেত্র সংযোজক অমল চক্রবর্তী, পরিষদের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সমিতির সদস্য বলরাম সাঁতরা, পরিষদের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের প্রচার-প্রসার প্রমুখ অরিন্দম কর, পরিষদের উত্তর কলকাতা বিভাগ সংগঠন সম্পাদক অনির্বাণ ভট্টাচার্য, পরিষদের উত্তর কলকাতা

জেলা সম্পাদক অভিজিৎ চৌধুরী এবং কসবা জেলা দুর্গাবাহিনীর কার্যকর্ত্রী শিল্পা মণ্ডল। বাংলাদেশে যেভাবে হিন্দুদের এবং মঠ-মন্দিরের ওপর জেহাদি আক্রমণ চলছে, সাধুসন্তদের ওপর আঘাত নেমে আসছে, হিন্দু নারীরা যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন, হিন্দুদের বাড়ি-ঘর, দোকানপাটে চলছে অগ্নিসংযোগ, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন বক্তারা। বাংলাদেশে হিন্দু গণহত্যা এবং এথনিক ক্লিনজিং চললেও সেই ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবীদের, বামপন্থীদের নীরবতার বিষয়টিও তাদের বক্তব্যে উঠে আসে। নোবেলবিজয়ী ইউনুসের মতো ভণ্ড বুদ্ধিজীবীর নেতৃত্বাধীন সরকারের জেহাদি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে, বাংলাদেশ জুড়ে ভারতের জাতীয় পতাকার অবমাননার বিরুদ্ধে বক্তারা প্রতিবাদে সোচ্চার হন। হিন্দুদের ওপর বাংলাদেশের জেহাদি প্রশাসনের নির্যাতন বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তাদের আন্দোলন চলতে থাকবে বলে পরিষদের কার্যকর্তারা সভামঞ্চ হতে ঘোষণা করেন। সভা পরিচালনা করেন বজরঙ্গ দলের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সহ-সংযোজক শঙ্কর বসু।

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার
ডিজাইনের ক্যাটালগ
সুপার
যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES • SUITS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidary Sarees
Contact No. : 033-22188744 / 1386

সিউড়ীতে ‘শ্রদ্ধা’র শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠান

৮০ বছর বয়স্ক ব্যক্তি যাঁরা সহস্র পূর্ণচন্দ্র দর্শন করেছেন, তাঁদের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্য, শুভাকাঙ্ক্ষী ও প্রতিবেশীদের নিয়ে ২০০৮ সাল থেকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে আসছেন বীরভূমের জেলা সদর সিউড়ীর ‘শ্রদ্ধা’ সংস্থা। গত ১ ডিসেম্বর বিকালে সিউড়ী ডাঙ্গালপাড়ার বাসিন্দা তথা সুসংগঠক, দক্ষ

সমাজকর্মী সুরঞ্জন ভট্টাচার্য (৮৮)-কে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হলো ১৫৬তম সহস্র পূর্ণচন্দ্র দর্শনকারী হিসেবে। ওঙ্কার ধ্বনি দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন সংস্থার সহ-সভাপতি জগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রদীপ প্রজ্বলন করেন সিউড়ী ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী স্বামী বরদানন্দ মহারাজ। সুরঞ্জন ভট্টাচার্যকে পূজা করলেন তাঁর কন্যা সুপর্ণা চট্টোপাধ্যায়। মাল্যদান করেন লক্ষ্মীনারায়ণ রায়। শ্রদ্ধার উদ্দেশ্য বলেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। শ্রীভট্টাচার্যকে উত্তরীয়, বস্ত্র, গীতা, ফল ও মিষ্টান্ন প্রদান করেন অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক ম্যানেজার পুলক সিনহা, সুকুমার ঘোষ, বিষ্ণুপদ রায়, জয়ন্ত ঘোষাল, মিনতি দাস প্রমুখ। আরতি করেন কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়। সহযোগিতায় সুজাতা বিষ্ণু। সংগীত পরিবেশন করেন অসীমা মুখোপাধ্যায়, কাকলি দাস ও সুব্রত নন্দন। অনুভব কথনে ছিলেন তাঁর পুত্র সমর্পণ ভট্টাচার্য। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন সম্পাদক দামোদর ঘোষাল। মানপত্র পাঠ করে শেষে শান্তি মন্ত্র উচ্চারণ করেন সংগঠন সম্পাদক লক্ষ্মণ বিষ্ণু। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাপতি মহাদেব মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রজিৎ দাস-সহ অন্যান্য প্রবীণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। শ্রীভট্টাচার্যকে প্রণাম করার পরে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন শিক্ষক-সাংবাদিক পতিত পাবন বৈরাগ্য।

ভারতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতির উদ্যোগে পুস্তক প্রকাশ অনুষ্ঠান

ইতিহাস সংকলন সমিতি উত্তরবঙ্গ প্রান্তের উদ্যোগে গত ১৭ নভেম্বর শিলিগুড়ি শহরের শ্রী ত্রিবেণী সংস্কৃত বেদ বিদ্যাপীঠে ‘Women Discourse in Indian Historical & Philosophical Writings’ পুস্তকের প্রকাশ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মোট ২২টি গবেষণামূলক প্রবন্ধ সংবলিত এই বইটি উন্মোচন করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ-সম্পর্ক প্রমুখ রমেশ পাপ্পাজী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক শ্যামাচরণ রায়, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সম্পর্ক প্রমুখ বিবেক সরাফ, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সহ-সামাজিক সদ্ভাব প্রমুখ রাজেন শর্মা, শিলিগুড়ি বিভাগ কার্যবাহ ডাঃ বিশ্বপ্রতীম রুদ্র।

ভারতের সঠিক ইতিহাস রচনা, বিকৃত ইতিহাসের বিনির্মাণ এবং ইতিহাস পুনর্নির্মাণে ইতিহাস সংকলন সমিতির গবেষক- অধ্যাপকদের সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের আহ্বান জানান রমেশজী। একই সঙ্গে স্থানীয় অজ্ঞাতপরিচয় বীর এবং ইতিহাসের উপেক্ষিত নায়কদের ঘটনাবলি দেশ ও সমাজের সামনে তুলে ধরার আবেদনও জানান তিনি।

বইটি সম্পাদনা করেছেন ড. গৌরী দে, অধ্যাপক বাপ্পা মোহন্ত ও সৌমেন্দ্রপ্রসাদ সাহা।

কলকাতায় প্রভু চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের মুক্তির দাবিতে পদযাত্রা হিন্দু জাগরণ মঞ্চের

বাংলাদেশে হিন্দু সন্ন্যাসী প্রভু চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে কলকাতায় গর্জে উঠল হিন্দুসমাজ। বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর ক্রমাগত নির্যাতনের প্রতিবাদে এবং ইসকনের সন্ন্যাসী প্রভু চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে কলকাতার রাস্তায় বিশাল পদযাত্রা করল বিভিন্ন হিন্দু সংগঠন। গত ২৮ নভেম্বর 'হিন্দু জাগরণ মঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ'-এর ডাকে এই প্রতিবাদী পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ-সহ বিভিন্ন সংগঠন। পদযাত্রার নেতৃত্বে ছিলেন বিভিন্ন মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসীরা। শিয়ালদহ থেকে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড ধরে গিয়ে বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশন দপ্তরের সামনে শেষ হয় এই পদযাত্রা। পদযাত্রা থেকে বাংলাদেশ জুড়ে হিন্দু নির্যাতনের বিরুদ্ধে ওঠে মুহুর্মুহু স্লোগান। বাংলাদেশে সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাস প্রভুর মুক্তির দাবিতে কলকাতায় পদযাত্রার ডাক দিয়েছিল হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। সেই পদযাত্রায় যোগদান করে বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী সংগঠন। মূলত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসেন অসংখ্য প্রতিবাদী মানুষ। পদযাত্রায় যোগদান করেন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র সাংসদ, বিধায়ক থেকে শুরু করে বিভিন্ন সংগঠনের কার্যকর্তারা।

এদিন পদযাত্রার শুরু থেকেই চিন্ময়কৃষ্ণ দাস প্রভুর মুক্তির দাবিতে স্লোগান ওঠে। স্লোগান ওঠে হিন্দু নির্যাতন বন্ধের দাবিতে। পদযাত্রার আয়োজক হিন্দু জাগরণ মঞ্চের কার্যকর্তারা জানান— যেভাবে সরকারি মদতে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর নির্যাতন চলছে, তা অবিলম্বে বন্ধ না হলে আরও বড়ো আন্দোলনে শামিল হবে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা। হিন্দুদের এই পদযাত্রা রোখার জন্য বেকবাগান মোড়ে বিশাল ব্যারিকেড করে কলকাতা পুলিশ। মোতায়েন ছিল প্রচুর পুলিশকর্মী। বেকবাগানে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি বাধে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের সদস্যদের। পুলিশের ব্যারিকেড ডেপুটি হাইকমিশনমুখী পদযাত্রা আটকালে উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশের সঙ্গে পদযাত্রায় যোগদানকারীদের বচসা ও ধস্তাধস্তি হয়। এই ঘটনায় হিন্দু জাগরণ মঞ্চের দু'জন কার্যকর্তা আহত হন। পরে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের ৫ জন সদস্য কমিশনের দপ্তরে যান।

প্রভু চিন্ময়কৃষ্ণকে নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে গত ২৭ নভেম্বর কলকাতার রাজপথে নেমেছিল বিজেপিও। রবীন্দ্র সদন থেকে বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনের দপ্তর পর্যন্ত পদযাত্রা করে যান বিজেপি নেতৃত্ব। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন কর্মী ও সমর্থকরা। পদযাত্রা শেষে ডেপুটি হাইকমিশনে যান পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-সহ কয়েকজন বিজেপি বিধায়ক। কমিশনের অফিস থেকে বেরিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বাংলাদেশিদের ভিসা বন্ধের আবেদন জানানো হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। একই সঙ্গে শুভেন্দুবাবু বাংলাদেশিদের উদ্দেশে বলেছেন, চিকিৎসার জন্য করাচি-লাহোর যান। এখানে আসবেন না।

কল্যাণ ভবনে ধর্ম জাগরণ সমন্বয়ের অভ্যাস বর্গ

গত ৩০ নভেম্বর এবং ১ ডিসেম্বর, কলকাতার মানিকতলা-স্থিত কল্যাণ ভবনে অনুষ্ঠিত হলো ধর্ম জাগরণ সমন্বয় দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের দু'দিন ব্যাপী অভ্যাস বর্গ। এই বর্গে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, স্বামী করুণা আরণ্যক মহারাজ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক সারদাপ্রসাদ পাল, সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক প্রশান্ত ভট্ট, ধর্ম জাগরণ সমন্বয় সমিতির সভাপতি ননীগোপাল সিংহ, সমিতির সম্পাদক সঞ্জীব চক্রবর্তী, ধর্ম জাগরণ সমন্বয় পূর্বক্ষেত্র প্রমুখ বিনয়জী। বিভিন্ন জেলা থেকে ৫৪ জন প্রতিনিধি এই বর্গে অংশগ্রহণ করেন। বর্গ সঞ্চালন করেন ধর্ম জাগরণ সমন্বয়, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সহ-সংযোজক রতন চক্রবর্তী।

বিপ্লবী পরীক্ষিৎ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবস উদ্‌যাপন

গত ২৬ নভেম্বর কলকাতার মহাজাতি সদনে বিপ্লবী বাঘা যতীনের দলের কর্মী বিপ্লবী পরীক্ষিৎ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ৬৮তম প্রয়াণ দিবস পালন করেন তাঁর নাতনি মঞ্জু মুখোপাধ্যায়, তাঁর নাতি অমল মুখোপাধ্যায়, 'শহিদ বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতি'র সম্পাদক তরুণ বিশ্বাস এবং অন্যান্য বিপ্লবী পরিবারের স্বজনরা। আর্তত্রাণে নিবেদিতপ্রাণ হওয়ার কারণে 'কাঙালদা' নামে সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন বিপ্লবী পরীক্ষিৎ চন্দ্র। তাঁর নাতি, নাতনি-সহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলেই স্মরণ করেন তাঁর জীবনচরিত। ১৮৮৯ সালে পূর্ববঙ্গের খুলনা জেলার খর্ণিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন মাতা কমলিনী মুখোপাধ্যায় এবং পিতা গুরুচরণ মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র পরীক্ষিৎ। স্বদেশী আন্দোলনে নিবেদিতপ্রাণ পরীক্ষিৎ মুখোপাধ্যায় সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। এই সময় তিনি কলকাতার 'অনুশীলন সমিতি'তে যোগ দেন। শুরু হয় এমএন রায়, শশাঙ্ক জোয়ারদার, নগেন দত্ত-সহ অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে একযোগে দেশের তথা দেশবাসীর স্বার্থরক্ষার দুরূহ কাজ।

বর্ধমানে বন্যাত্রাণে যোগ দিতে গিয়ে বিপ্লবী বাঘা যতীন, ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিপ্লবীর সংস্পর্শে আসেন। বিপ্লবী সংগঠন 'যুগান্তর দল'-এর সঙ্গে যুক্ত হন। এরপর তাঁর দীর্ঘ বিপ্লবী জীবনে একাধিকবার কারারুদ্ধ হয়েছেন, কারাগারে 'চুয়াল্লিশ ডিগ্রি'তে নির্যাতিত হয়েছেন। দেশমাতৃকার শ্রীচরণে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ এই বিপ্লবী ১৯৩৮ সালে ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন।

এরপর খুলনা জেলার সাতক্ষীরা থেকে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি'র সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৮ সালে ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে রাজনীতি থেকে অবসরগ্রহণ করেন। ১৯৫৬ সালের ২৬ নভেম্বর এই মহান বিপ্লবী কলকাতায় অত্যন্ত দুঃস্থ অবস্থায় পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে স্ত্রী হৈমবতী এবং পাঁচ সন্তানকে রেখে যান। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বিপ্লবী পরীক্ষিৎ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

হিন্দু নির্যাতন ও প্রভু চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে মালদহে হিন্দু চেতনা মঞ্চের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা

বাংলাদেশে ক্রমাগত হিন্দু নির্যাতন এবং সন্ন্যাসী প্রভু চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে হিন্দু চেতনা মঞ্চের উদ্যোগে গত ৪ ডিসেম্বর মালদহ শহরে এক বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। পুড়াটুলি বাঁধরোড থেকে মিছিল শুরু হয়ে সভাস্থল শহরের ফোয়ারা মোড়ে পৌঁছয়। উপস্থিত ছিলেন সাহাপুর ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অধ্যক্ষ স্বামী শিবসুন্দর মহারাজ, উত্তরবঙ্গ হিন্দু চেতনা মঞ্চের সংযোজক রাজু কর্মকার, জেলা কার্যকর্ত্রী শ্রীমতী সোনালি পাল, জেলা কার্যকর্তা কাজল গোস্বামী এবং নারীশক্তি প্রমুখ শ্রীমতী নীলম ভট্টাচার্য। সভা সঞ্চালনা করেন তাপস সুকুল।

সঙ্ঘজননী মা সারদা

সারদা সরকার

স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার সময়ে (১ মে ১৮৯৭) বলেছিলেন সকলের উদ্দেশ্যে, 'শ্রীশ্রীমাকে কি রামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণী বলে, আমাদের গুরুপত্নী হিসেবে মনে করো? তিনি শুধু তাই নয় রে ভাই, আমাদের এই যে সঙ্ঘ হতে চলেছে, তিনি তাঁর রক্ষাকর্ত্রী, পালনকারিণী, তিনি আমাদের সঙ্ঘজননী।'

তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সহধর্মিণী। সকলের কাছে তিনি মা। কথার কথা মা নয়, পাতানো মা নয়, গুরুপত্নী নয়। তিনি সত্যিকারের মা। ভগিনী নিবেদিতার কথায় জগতের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের যে ভালোবাসা ছিল সেই ভালোবাসা ধারণের পাত্রই ছিলেন শ্রীশ্রী মা। মা নিজেও বলেছেন জগতের সকলের প্রতি ঠাকুরের মাতৃভাব ছিল, সেই ভাবটি বিকাশের জন্যই তিনি আমাকে রেখে গেছেন। ঠাকুর আর মা কখনই আলাদা ছিলেন না। তবু ঠাকুরও বলেছেন, যে মা মন্দিরে আছেন, যিনি এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন, আর যিনি এখন নবহতখানায় আছেন, তাদের সকলকে আমার এক বলে মনে হয়। সাক্ষাৎ আনন্দময়ী। ঠাকুরের সমস্ত শক্তি নিয়েই পরবর্তীকালে মা হলেন সঙ্ঘজননী তথা বিশ্বজননী।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'এমন কেউ ছিল না, যে একটু সহানুভূতি জানাবে আমাদের, শুধু একজন ছাড়া। তিনি একজন নারী। একমাত্র তিনিই আমাদের আদর্শের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করতেন। যদিও তিনি ছিলেন অসহায়, আমাদের চেয়েও দরিদ্র।' তিনি মা সারদা। অর্ধাহারে অনাহারে যখন ঠাকুরের সন্তানেরা ভিক্ষান্নে দিনযাপন করছিল, তপোক্লিষ্ট সন্তানদের সংগ্রামের এই নিদারুণ কষ্টে মা বড়ো আকুল হয়ে উঠতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতেন। মায়ের অন্তরের এই আকুল প্রার্থনা বুঝি বিফলে যায়নি। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘপরিবার গড়ে উঠল যার আজও চালিকাশক্তি শুধুমাত্র মা। মা চাইতেন যেন এদের যেন মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব না থাকে। বরাহনগরে, আলমবাজারে, বেলুড়ে মঠ হলো। রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের রূপরেখা তৈরি হলো যার অন্তরাত্মা হলেন শ্রীশ্রী মা। আজ যে বিশ্বজোড়া শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দধারা বয়ে চলেছে তার মূলে রয়েছেন মা। সকলের প্রতি ছিল তাঁর সহমর্মিতা ও সৌহার্দ্য-সম্পর্ক। বড়ো সোহাগের মা আমার।

সকলের প্রতি মায়ের ছিল আকুল করা টান। কারও ব্যবহারে কোনও সন্তান দুঃখ পেলে মা খুব কষ্ট পেতেন, বলতেন, 'সে কি গো? ...ভালোবাসাই তো আমাদের আসল। ভালোবাসাতেই তো তাঁর সংসার গড়ে উঠেছে।' এভাবে তিনি ভালোবাসার সূত্রে বেঁধে রাখতেন সঙ্ঘসেবকদের। কোমলে-কঠোরে রাখতেন সর্বত্র সজাগ দৃষ্টি।

এক ব্রহ্মচারীকে কোনও অপরাধে মঠ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। তিনি সোজা শ্রীশ্রীমায়ের কাছে চলে আসেন ও

অপরাধ স্বীকার করে কেঁদে পড়েন, মা তাকে কিছুদিন নিজের কাছে রাখেন। পরে বাবুরাম মহারাজ মা'র সঙ্গে দেখা করতে এলে একটা চিঠি দিয়ে তাঁর সঙ্গে তাকে ফেরত পাঠান মঠে। মা লিখেছিলেন, 'বাবাজীবন তারক, এই ছেলেটি অপরাধ করেছে। কিন্তু এখন সে অনুতপ্ত। একে মঠে স্থান দিও।' মহাপুরুষ মহারাজ এই চিঠি পড়ে বলেন, 'ব্যাটা, তুই একেবারে হাইকোর্টে আপিল করেছিস।' শ্রীশ্রীমায়ের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তিনি সঙ্ঘনেত্রী। তাঁর কথার ওপর কোনও কথাই আর চলে না। তিনিই সন্তানদের পরম আশ্রয় ও চরম নির্দেশিকা। আবার তাঁর কোনো সন্তানরা মারা গেলে মা আকুল হয়ে হাহাকার করেছেন।

কাশ্মীর থেকে ফেরার পর নিবেদিতা বায়না ধরেছিলেন মায়ের বাড়িতেই থাকার জন্যে। কিন্তু মায়ের বাড়িতে যেসব হিন্দু মেয়ে থাকতেন এ তাদের একেবারেই পছন্দের ছিল না। গোপালের মাও এই নিয়ে খুব আপত্তি করেছিলেন। পরে মায়ের ইচ্ছেতেই একটি ঘর খালি করা হয় নিবেদিতার জন্য। সেখানে আট দশ দিন ছিলেন নিবেদিতা। নিবেদিতা একজায়গায় লিখেছেন, 'আমি যে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হলাম তা ভারী অদ্ভুত ধরনের।' একতলায় ঢোকার মুখে দু'দিকে দুটি ঘর ছিল। একটি ঘরে সাধু যোগানন্দ বাস করতেন, ক্ষয় রোগে তিনি অসুস্থ ছিলেন তখনই। নিবেদিতাকে বাংলা শেখাতেন। পিছনের রান্নাঘরে তার এক শিষ্য এবং এক ব্রাহ্মণ কাজকর্ম করতেন, ছাদ বারান্দা সমেত সমস্ত উপরতলা আমাদের, অদূরেই গঙ্গা, উপরতলা থেকে গঙ্গা দর্শন হতো।

শ্রীশ্রীমা পড়তে জানেন এবং অনেকটা সময় রামায়ণ পাঠ করে কাটান। তিনি লিখতে পারেন না কিন্তু তাতে তাঁকে শিক্ষিতা নয় এরকম মনে করার কোনো কারণ নেই। ভারতবর্ষের অধিকাংশ তীর্থস্থান তিনি ঘুরেছেন। দীর্ঘদিন সংসার ও ধর্মজগৎ সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। মা বড়ো মধুর, কঠিন বিষয় নিজের স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সহজ সরল করে নেন। নিজের ঘরে যখন পূজায় বসেন, মেয়েদের দীপ জ্বালা, গঙ্গাজল আনা, ধূপধুনো জ্বালা, ফুলের নৈবেদ্য সাজানোতে ব্যস্ত থাকতেন। দুপুরে খাওয়ার পর বিকেলে বিশ্রাম, তারপর সন্ধে হলে ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বালা হতো। শ্রীশ্রীমার সঙ্গে ছাদে তুলসীতলায় যেত সকলে। গুরুপ্রণামের পর মায়ের আর গোলাপ মায়ের পায়ে সবাই প্রণাম করত।'

এমন সাদামাটা হিন্দুপরিবারে স্থান পেতে চেয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। মাত্র সাত আটদিনই মায়ের সঙ্গে ছিলেন নিবেদিতা। অটুট বাঁধনে বেঁধে নিয়েছিলেন মা নিবেদিতাকে। পাড়ার লোকেরা অনেক কিছু বলাবলি করছিল, বাড়িতে ফিরিঙ্গি মেয়েকে ঠাঁই দেবার জন্য। কিন্তু মা তো সত্যিকারের মা, নিজের মেয়েকে লোকের কথায় ছেড়ে দেবেন কেমন করে? মা বলতেন, 'আহা কী সরল বিশ্বাস, যেন সাক্ষাৎ দেবী, নরেনকে কী ভক্তিই করে। সে এই দেশে জন্মেছে বলে সর্বস্ব ছেড়ে এসে প্রাণ দিয়ে কাজ করছে। কী গুরুভক্তি। এদেশের উপরই ভালোবাসা!' নিবেদিতা তার গর্ভধারিণীকে বলতেন লিটল মাদার আর সারদা মা হয়ে উঠলেন তাঁর নিজেরই মা! এর মধ্যে সত্যিকারেরই বিব্রত হতে হচ্ছিল এই বাড়ির মানুষগুলোকে নিবেদিতাকে আশ্রয় দেবার জন্য। তাই মায়ের ইচ্ছে না থাকলেও পাশেই আরেকটি বাড়িতে ১৬নং বোসপাড়া লেনে নিবেদিতা উঠে গেলেন। কিন্তু ওই ঘুপচি বাড়িটা এত ছোট্ট ছিল, গরমকালে নিবেদিতার বড়ো কষ্ট হতো, তাই প্রায় প্রতিদিন বিকেল বেলায় মায়ের নির্দেশে নিবেদিতা আসতেন মায়ের বাড়ি বিশ্রাম নিতে। কারুর কোনো নির্দিষ্ট ঘর ছিল না, লাল মেঝেতে সারি সারি মাদুর বিছানো থাকত। মায়ের অন্য মেয়েদের সঙ্গে সাগরপারের এই খুকিও মায়ের আঁচলধরা আদুরে মেয়ে হয়ে উঠেছিলেন। তাই না ১৩ নভেম্বর ১৬ নম্বর বোসপাড়া লেনে মা সারদা নিবেদিতার বাড়িতে এসে পূজা করে স্কুলের সূচনা করলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী সারদানন্দ এবং মায়ের কিছু মহিলা ভক্তকে নিয়ে পূজা হলো। আজকের শিশুরা ভবিষ্যতের শিক্ষিতা হিন্দু বিদুষী নারী হয়ে উঠবে। স্বামীজীর স্বপ্ন সফল করতে মায়ের আশীর্বাদ ছাড়া আর কী পাথেয় হতে পারত সেদিন?

১৮৯৯ সালে স্বামী যোগানন্দ দেহ রাখলেন। সেই স্বামী যোগানন্দ যিনি ভগিনী নিবেদিতাকে প্রথম মায়ের সঙ্গে দেখা করতে নিয়ে এসেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে। নিবেদিতা তার প্রিয় বান্ধবী জোসেফিনকে পরের দিন চিঠিতে লিখছেন সে কথা। মা নিজের ঘরে পা ছড়িয়ে বসে আকুল হয়ে কাঁদছেন, কেউ তাঁকে সান্ত্বনা দিতে গেলে তিনি বলেন আমার ছেলে যোগেনের কী হবে বাবা? আমি যে দেখলুম ঠাকুর নিতে এসেছেন। বলেই বললেন কাউকে বোলো না— বলতে নেই। বিকেলবেলা যোগানন্দ বললেন আমাকে গীতা পড়ে শোনাও— গীতাপাঠ শেষ হলে তিনি বলেন সব কিছু বিলীন হয়ে যাচ্ছে— আর কোনো কষ্ট নেই— এই বলে জয় রামকৃষ্ণ বলে ঢলে পড়লেন। মাথার কাছে বসে ছিলেন কৃষ্ণলাল মহারাজ, তিনি চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলেন— উপর থেকে মা-ও হাহাকার করে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। নিবেদিতা তখন মায়ের হাত ধরে বসে রয়েছেন পাশটিতে।

এমনভাবে অনেক সময় কাটল, স্বামীজীও এসেছিলেন, কিন্তু তিনি নিজেই

তো অসুস্থ, তাই গিরীশবাবু তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে মঠে ফেরত পাঠালেন। এমন সময় পঞ্চাশ ষাট জনের সমবেত হরি ওঁ মন্ত্র শুনতে পেয়ে মা নিবেদিতাকে তাড়াতাড়ি নেমে যেতে বললেন। মাথায় গেরুয়া রঙের রেশমি পাগড়ি-সহ স্বামীজীর ছড়িয়ে দেওয়া ফুলে সর্বাঙ্গ ঢাকা মরদেহটি সদানন্দ এবং অন্য আরেকজন তুলে ধরতেই কর্পূর জ্বেলে আরতি করা হলো। নামগান করতে লাগল সকলে। এতকাল যিনি ছিলেন গৃহের কর্তা তিনি আজ চিরতরে ঘর ছেড়ে চললেন। মা আর যোগীন মা'র হৃদয় বুঝি ভেঙে গেল— বাড়ির একখানা ইট খসল এবার, সব যাবে।' মা তারপর ছ'মাসের জন্য গ্রামের বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। ১৯১১ সালের মায়ের আদরের খুকি নিবেদিতাও ছেড়ে গিয়েছিলেন এই পৃথিবী থেকে। সেদিনও হয়তো মা ডুকরে কেঁদেছিলেন এই অভাগী ভিনদেশি বিদেশি কন্যাটির জন্য। কিন্তু তার আগে এই চিঠিটাই তাঁর মায়ের পায়ে শেষ অর্ঘ্য ছিল।

১৯১০ সালে ১১ ডিসেম্বর কেমব্রিজ থেকে মাকে লেখা চিঠি নিবেদিতার,

আদরিণী মা,

সারার জন্য প্রার্থনা করব বলে গির্জায় গিয়েছিলাম, সবাই যেখানে যিশুজননী মেরির কথা ভাবছে। আমার মনে পড়ে গেল তোমার কথা। তোমার সেই মনোরম মুখখানি, সেই স্নেহভরা চাহনি, পরনে সাদা শাড়ি, তোমার হাতের বালা, সবই যেন বাস্তব হয়ে ফুটে উঠল। আমার মনে হলো তোমার সেই ভালোবাসামাখা মনটাই সারার রোগজর্জর দেহে নিয়ে আসবে শান্তি ও আশীর্বাদ। আমি আরও কি ভাবছিলাম জানো মা? ভাবছিলাম, শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ধ্যারতির সময় তোমার ঘরে বসে যে আমি ধ্যান করবার চেষ্টা করেছিলাম, সেটা কী বোকামিই ছিল। মা মাগো, তখন কেন বুঝিনি যে তোমার পায়ের কাছে ছোট্ট শিশুর মতো বসে থাকাটা যথেষ্ট। মাগো ভালোবাসায় ভরা তুমি, আমাদের জাগতিক ভালোবাসার মতো তাতে উত্তেজনা বা উগ্রতা নেই, তোমার ভালোবাসায় একটা সুস্নিগ্ধ শান্তি রয়েছে। সকলকে তুমি সেই সোনারকাঠি ছুঁইয়ে দাও আর তোমার কল্যাণস্পর্শে সকলের দুঃখ দূর করো।

কয়েকমাস আগে মাগো সেই রবিবারের কথাটা মনে পড়ে, গঙ্গাস্নানে যাবার আগে আমি তোমার কাছে ছুটে গিয়েছিলাম, আবার স্নান করে এসেই তোমার ঘরে গেলাম, তুমি আমার মাথায় হাত রাখলে মা মাগো, আমার সব বেদনার মুক্তি হলো যেন। প্রেমময়ী মা আমার, তোমার জন্য যদি একটি কবিতা বা গান লিখে পাঠাতে পারতাম, তাতেও মনে হবে সেটা উগ্রতা। এই কোলাহল তোমার ভালোবাসার জন্যে নয়। তুমি ঈশ্বরের আশ্চর্যতম সৃষ্টি। শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বপ্রেম সুধাধারণের পাত্র। এই সঙ্গহীন দিনে তুমিই রয়েছ তাঁর সন্তানদের কাছে ঠাকুরের প্রতীক হয়ে। তোমার কাছে আমাদের শান্ত স্তব্ধ হয়ে থাকা উচিত, অবশ্য কিছু কিছু মজা করার সময় ছাড়া। ভগবানের যা কিছু বিস্ময়কর সৃষ্টি সবই তোমার মতো; বাতাস, আলো, ফুলের সুগন্ধ, গঙ্গার স্নিগ্ধতা এই সব শান্ত নীরব জিনিসই তোমার তুলনা মা।

বেচারি সারার জন্য তোমার আঁচলখানি পাঠিয়ে দিও, রাগ দ্বেষের ঊর্ধ্বে যে গহন প্রশান্তি, তোমার নামটি সেখানেই সমাহিত। সেই প্রশান্তি পদ্মপাতায় জলের মতো, কখনই মলিন হয় না। বড়ো সোহাগের মা আমার!

তোমার চিরদিনের নির্বোধ খুকি
নিবেদিতা।

শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরে থাকাকালীন সারদাদেবীকে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ গা, তুমি কি কিছু করবে না? এই-ই (নিজেকে দেখিয়ে) সব করবে?' মা বলেছিলেন 'আমি মেয়েমানুষ, আমি কী করতে পারি?' মা নিজেকে অবগুণ্ঠনে আবৃত রাখতে চেয়েছিলেন সামান্য মেয়েমানুষ বলে। কিন্তু তিনি তো অসামান্য। তাই তো শ্রীরামকৃষ্ণকে বলতে হয়েছে, 'ও আমার শক্তি।' ফলহারিণী কালিকাপূজায় স্বয়ং রামকৃষ্ণ পূজা করেছেন মায়ের ত্যাগ, তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাশীলতা স্বরূপ সংগঠনী শক্তিকে। মাতৃত্বের স্নেহছায়ায় মা সকলকে যেমন আশ্রয় দেন, তেমন মাঝে মাঝে প্রয়োজনে কঠোর হতেও জানেন।

নিঃসন্তান মা স্বামী শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে মৃদু অভিযোগও করেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ জানিয়েছেন, কালে কালে কত সন্তান তাঁকে মা বলে ডাকবে, পালন করতে হবে মাতৃত্বের গুরুদায়িত্ব। কাশীপুর উদ্যানবাটিতে মহাসমাধির আগে বলে যান, ক্লিষ্ট মানুষগুলির দায় মাকেই নিতে হবে।

তাই তো মা আজ সঙ্ঘজননী রূপের পূর্ণায়ন। আর যখন তিনি প্রতিশ্রুতি দেন— 'জানবে, তোমার একজন মা আছেন' —তখন আমরা সবাই জানি পরমহংস যায় যাক, আমাদের মা ঠাকুরানি আছেন হাতটি ধরে। তিনি 'সতেরও মা, অসতেরও মা'। আজ থেকে এতগুলো বছর আগে, যখন সমাজ আরও ভেদভাবে ক্লিষ্ট, তখন তিনি স্বামী সারদানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দকেও যেমন নিজের ছেলের আদর দিয়েছেন, তেমনই ভালোবেসেছেন ডাকাত ছেলে আমজাদকে।

হিন্দুঘরের বিধবা ব্রাহ্মণী যাঁকে সবসময় ঘিরে থাকত বামুন কায়েত ঘরের বউ ঝিয়েরা, এমন নিষ্ঠাপরায়ণ মা অজ্ঞাতকুলশীল যবনী নিবেদিতাকে এক কথায় দান করলেন এক অপরিসীম ভালোবাসার স্বীকৃতি, সমাজের তোয়াক্কা করলেনই না। অথচ এই বিপ্লবটুকু হলো নীরবে, নিঃশব্দে, শুধু ভালোবাসার জোরে। এই মা সঙ্ঘজননী শান্ত কোমল ভালোবাসা দিয়ে গড়া পৃথিবীর মা, শ্রীরামকৃষ্ণের সারদা। ◻

গ্রামবাঙ্গলার হারিয়ে যাওয়া এক ঐতিহ্য ঢেঁকি

বৈশাখী কুণ্ডু

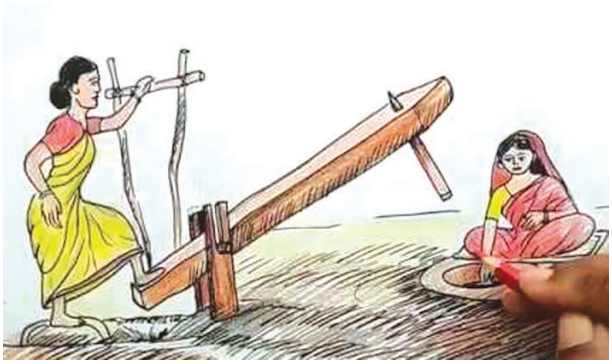

গ্রামবাঙ্গলার হারিয়ে যাওয়া একটি ঐতিহ্য হলো ঢেঁকি। ঢেঁকি নিয়ে বঙ্গের মানুষের মুখে মুখে বেশ কয়েকটি প্রবাদ প্রচলিত। যেমন 'অকম্মার ঢেঁকি', 'বুদ্ধির ঢেঁকি', 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে' ইত্যাদি। আবার কবিগুরুর 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতায় কৃষ্ণকান্ত ওরফে কেষ্টা তার মনিবের কাছে ছিল বুদ্ধির ঢেঁকি অর্থাৎ বুদ্ধিহীন। নারদ মুনির বাহন ঢেঁকি। তিনি সর্বদা নারায়ণ নাম জপেন। নারদ কথার অর্থ হলো যিনি জল দান করেন। কৃষিকাজের অপরিহার্য হলো জল। কৃষিজাত দ্রব্য পেষাই করে দানা বের করাই হলো ঢেঁকির কাজ। প্রবাদবাক্যগুলি দেখে মনে হয় ঢেঁকি যেন এক অযোগ্য বস্তু। বাস্তবিক তা নয়। প্রাচীনকাল থেকে মানুষ বিবর্তনের মধ্য দিয়েই উন্নত থেকে উন্নততর হয়েছে। পূর্ব ভারতে ঢেঁকির প্রচলন ছিল। মানুষ প্রাথমিক পর্যায়ে শস্য উৎপাদন করে পাথরের উপর পাথর দিয়ে ঘষে তা থেকে শস্যদানা বের করতো। তারপর আবিষ্কার হলো উদুখল। একটি বড়ো পাত্রের মধ্যে শস্য রেখে কাঠের দণ্ড দিয়ে পেষাই করে দানা বের করা হতো। পরবর্তী পর্যায়ে এল যাঁতা। তারপর এল ঢেঁকি। শাল, অর্জুন, বাবলা, তেঁতুল গাছের কাঠের মতো শক্ত কাঠ দিয়ে ঢেঁকি তৈরি হয়। একসময় গৃহস্থের বাড়িতে ঢেঁকিশাল বা ঢেঁকিঘর থাকত। ঢেঁকির বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন নাম। যেমন— সামনের অংশের নাম 'মুষল'। মুষলের মুখে লাগানো লোহার বেড়ির নাম 'শামা'। মাটিতে যেই গর্তের মধ্যে শস্য রাখা হয় তার নাম 'গড়'। যে মহিলা ধান ভানে তাকে 'ভানারি' বলে। ঢেঁকির পিছনের অংশে চাপ দিলে মাথার অংশটা ওঠা-নামা করা হয়। তাকে বলে পাড় দেওয়া। আকৃতিতে সাড়ে পাঁচ থেকে ছয় ফুটের মতো লম্বা, আট থেকে নয় ইঞ্চি চওড়া। গাছের মোটা অংশ দিয়ে ঢেঁকির মূল কাঠামো তৈরি করা হয়।

মেঝে থেকে কিছুটা উপরে ঢেঁকি বসানো হয়। সামনের দিকে একটা কাঠ থাকে যেটি মাটির গর্তের মধ্যে, সেটির মাধ্যমেই শস্য পেষাই হয়, তাকে বলে 'মৌনা'। গৃহস্থের ঘরে ঢেঁকি চললে বোঝা যেত যে তার ঘরে শস্য আছে। ঠাকুরঘরের মতো ঢেঁকিশালকেও পবিত্র গণ্য করা হয়। মহিলারা সকাল-সন্ধ্যে মারুলি ও সাঁঝ দেয়। মারুলি হলো গোবর দিয়ে কিছুটা জায়গা গোল করে নিকানো এবং সাঁঝ হলো সন্ধ্যাপ্রদীপ দেখানো। ঢেঁকিশাল হলো মহিলাদের নিজস্ব জায়গা। এখানে ধান ভানার পাশাপাশি চলতো গল্পগুজব। তাই বলে 'ধান ভানতে শিবের গীত'।

রবিঠাকুরের ভাষায়, 'ঢেঁকি পেতে ধান ভানে বুড়ি। খোলা পেতে ভাজে খই মুড়ি।' কয়েকশো বছর ধরে বঙ্গসংস্কৃতির অঙ্গ ছিল ঢেঁকি। দাঁড়িয়ে একজন বা দু'জন মিলে পা দিয়ে চাপ দিয়ে জোরে জোরে ওঠা-নামা করাতেন, তার সঙ্গে চলতো গান— 'ও ধান ভানিরে ঢেঁকিতে পাড় দিয়া, ঢেঁকি নাচে, আমি নাচি হেলিয়া দুলিয়া, ও ধান ভানিরে'। গানের তালে তালে পা চলতো। ধান ভাঙিয়ে চাল বের করা, গম ও ভুট্টা থেকে আটা বা ছাতু তৈরি, ডাল, শুকনো লঙ্কা, হলুদ ইত্যাদি গুঁড়ো করার এটি ছিল একমাত্র মাধ্যম। হেমন্তকাল এলেই কেমন যেন নতুন ধানের চালের গন্ধে চারিদিক ম ম করতো। বাড়ি বাড়ি চাল গুঁড়ো করার হিড়িক পড়ে যেত। মাঠ থেকে ধান কেটে মাথায় করে বাড়ির উঠোনে নিয়ে আসা হতো। তারপর ধান ঝেড়ে, সিদ্ধ করে রোদে শুকিয়ে তারপর যেত ঢেঁকিতে। দীর্ঘ পদ্ধতির পর বাঙ্গালির রান্নাঘরের হাঁড়িতে টগবগ করে চাল ফুটে ভাত হতো। কালের বিবর্তনে ঢেঁকির গুরুত্ব হারিয়ে গেছে। উন্নতি প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে কম সময়ে অনেক বেশি শস্য ঝাড়াই পেষাই হচ্ছে। বেশি লাভ হচ্ছে। কিন্তু কৃষকের ঘরের সেই মনোরম দৃশ্যগুলো হারিয়ে গেছে। ভোরবেলা ঢেঁকির ছন্দময় শব্দে ঘুম ভাঙতো গৃহস্থের। এখনো গ্রামের দিকে কিছু চাষির ঘরে এই সম্পদটি দেখা যায়। পৌষ সংক্রান্তির সময় নতুন ধান উঠলে চাল গুঁড়ো করে পিঠেপুলি উৎসবে ঢেঁকির ব্যবহার হয়। বর্তমান প্রজন্ম এই পুরনো ঐতিহ্যটি সম্বন্ধে প্রায় জানে না বললেই চলে। অনেক জায়গায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে আয়োজিত গ্রামীণ মেলাপ্রাঙ্গণে ঢেঁকির প্রদর্শন করা হচ্ছে। □

মা সারদার দক্ষিণেশ্বরের নহবতজীবন

ড. অলি ব্যানার্জী

জয়রামবাটীর রামচন্দ্র মুখুজ্যের ‘কুটোবাঁধা কনে’ সারদামণির সঙ্গে ১২৬৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখের শেষভাগে শ্রীরামকৃষ্ণের বিবাহ হয়। লীলাবিগ্রহবান শ্রীরামকৃষ্ণ সহধর্মিণীকে ক্রমে ক্রমে তাঁর সাধনার উত্তরাধিকারিণী রূপে জগতে মাতৃত্বের মহিমা প্রচারের জন্য প্রস্তুত করতে থাকেন। বিয়ের বারো বছর পরে হঠাৎই লোকমুখে মা শোনেন যে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ উন্মাদ হয়ে গেছেন। একথা শুনে সারদা মা বাবার সঙ্গে স্বামী সন্দর্শনে চললেন। দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছে মা শুনতে পেলেন, ঠাকুর বলছেন, ‘ও হৃদু, বারবেলা নাই তো রে? প্রথমবার আসছে।’ শ্রীরামকৃষ্ণের সেই কথাতে এমন একটি অদ্ভুত প্রেমের স্পর্শ ছিল, যার টানে মা সোজা ঠাকুরের ঘরে গিয়ে উঠলেন। ঠাকুর মায়ের সঙ্গে কথা বলে জানলেন যে, মা অসুস্থ, তখন নিজের ঘরেই মা’র সুচিকিৎসার ব্যবস্থায় তিন-চার দিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে মা নহবতে ঠাকুরের জননী চন্দ্রমণির কাছে চলে গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ দর্শনের ফলে মা অনুভব করলেন যে, তাঁর স্বামী উন্মাদ নন। তাই মা প্রাণের উল্লাসে নহবতে থেকে ঠাকুর ও তাঁর জননীর সেবায় নিজেকে ঢেলে দিলেন। ঠাকুরের কাছ থেকে এই সময়ে গৃহকর্ম, আত্মীয়দের প্রতি ব্যবহার, অপরের গৃহে ভব্যতা প্রভৃতি সাংসারিক শিক্ষা থেকে শুরু করে ভজন, কীর্তন, ধ্যান, সমাধি, ব্রহ্মজ্ঞান তত্ত্বকথা শুনে মায়ের কাছে মানবজীবনের কর্তব্য ও উদ্দেশ্য অতি স্পষ্টভাবে প্রকটিত হয়েছিল।

মা সারাদিন নহবতে থেকে সংসারের কাজকর্ম করতেন, কিন্তু প্রতিরাত্রে তিনি ঠাকুরের ঘরে তাঁরই শয্যায় শয়নের অনুমতি পেয়েছিলেন। এরই একসময়ে মাকে একান্তে পেয়ে ঠাকুর পরীক্ষাচ্ছলে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘কী গো, তুমি কি আমায় সংসারপথে টেনে নিতে এসেছ?’ মা উত্তর দিয়েছিলেন, ‘না, আমি তোমাকে সংসারপথে কেন টানতে যাব? তোমার ইষ্টপথেই সাহায্য করতে এসেছি।’ মাও একদিন ঠাকুরের পদসেবা করতে করতে জানতে চেয়েছিলেন, ‘আমাকে তোমার কী বলে মনে হয়?’ ঠাকুর বলেছিলেন, ‘যে মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এ শরীরের জন্ম দিয়েছেন এবং এখন নহবতে বাস করছেন, আর তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ী-রূপ বলে তোমায় সর্বদা সত্য সত্য দেখতে পাই।’

মায়ের প্রথম আগমনের পর তাঁর সঙ্গে এক শয্যায় শয়ন করে ঠাকুর তাঁর পবিত্রতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দিগ্ধ হয়ে ১২৭৯ সালের ২৪ জ্যৈষ্ঠ (৫ জুন, ১৮৭২) অমাবস্যা তিথি, ফলহারিণী-কালিকাপূজার দিনে মাকে দেবীত্বে উত্তরণের নিমিত্ত তাঁকে ষোড়শী (শ্রীবিদ্যা বা ত্রিপুরসুন্দরী) রূপে ঠাকুর আরাধনা করলেন। মা ভাবরাজ্যে আরূঢ় হয়ে ঠাকুরের পূজা এবং তার সঙ্গে তাঁর সাধনলব্ধ সমস্ত ফল গ্রহণ করলেন। বস্তুত তিনি বিনা সাধনায় সমস্ত সিদ্ধির অধিকারিণী হলেন, ব্যুত্থিতাবস্থায়ও তিনি সর্বজীবে ব্রহ্মবুদ্ধি রাখতে শিখলেন। ষোড়শীপূজার পরেও মা পাঁচ-ছয় মাস রাত্রিকালে ঠাকুরের শয্যাপার্শ্বে শয়ন করেছিলেন। ঠাকুরের অদ্ভুত ভাব ও সমাধির সঙ্গে তখনও পূর্ণ পরিচয় না থাকায় তিনি একদিকে যেমন স্বামীসান্নিধ্যে আনন্দ পেতেন, অন্যদিকে তেমনি ভয়ে রাতে জেগে থাকতেন। ঠাকুর একথা জানতে পেরে মাকে নহবতে আলাদা শুতে বলেন। মা নহবতেই থাকুন আর ঠাকুরের ঘরেই থাকুন, তিনি ঠাকুর ও ঠাকুরের জননীর সেবাকেই সম্বল করে নিয়েছিলেন।

এই সেবা অবলম্বনে তিনি ঠাকুরের যেটুকু সাহচর্য পেতেন, তাই তাঁর কাছে যথেষ্ট ছিল। বাহ্যভূমিতে বিচরণকালে ঠাকুর এই সময়ে প্রকৃতির ভাবের প্রাধান্যবশত নিজেকে জগদম্বার সখী বা পরিচারিকা মনে করতেন এবং মাকে ওইরূপ জগদম্বার অপর সখী বলে ভাবতেন। মাও সানন্দে ও সযত্নে ঠাকুরকে নারীবেশে সাজিয়ে নিজেকে তাঁর সখী ভেবে আনন্দিত হতেন। ষোড়শী পূজার প্রায় এক বছর পরে মা অসুস্থ হয়ে পড়ায় ঠাকুরের দ্বিতীয় রসদদার শম্ভুনাথ মল্লিক অনেক চিকিৎসা করালেন কিন্তু কোনো ফল হলো না। অগত্যা দক্ষিণেশ্বরে থেকে ঠাকুরের উদ্বেগ উৎপাদন অনুচিত মনে করে মা কামারপুকুর হয়ে জয়রামবাটী চলে গেলেন।

পরের বছর বৈশাখ মাসে তিনি দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আসেন এবং শাশুড়ির সঙ্গে অল্পপরিসর নহবতে আশ্রয় নেন। দক্ষিণেশ্বরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বর্ষাতে মা আমাশা রোগে আক্রান্ত হলেন। তাঁকে নীরোগ করবার জন্য শম্ভুবাবুর সমস্ত যত্ন নিষ্ফল হলো। মা তবুও শাশুড়ি ও স্বামীর সেবা ছেড়ে কোথাও যেতে না চাওয়ায় অসুখ নিয়েও আরও এক বছর ওই ভাবেই কাটালেন। অবশেষে একটু সুস্থ হলে সম্ভবত ১২৮২ সালের আশ্বিন মাসে তিনি বাপের বাড়ি চলে যান।

শম্ভুবাবু বুঝতে পেরেছিলেন যে, গ্রামের স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে বেড়ে ওঠা মায়ের পক্ষে ওই পিঞ্জরপ্রায় নহবত-গৃহে বাস করা কতটা কষ্টদায়ক ও স্বাস্থ্যহানিকর। তাই মায়ের তৃতীয়বার (মার্চ, ১৮৭৬) দক্ষিণেশ্বরে ফেরবার আগেই তিনি মায়ের জন্য কালীমন্দিরের কাছেই একখানি চালাঘর তৈরি করে দেন। মা ওইখানে ঠাকুরের খাবারদাবার তৈরি করে মন্দিরোদ্যানে নিয়ে গিয়ে ঠাকুরকে খাইয়ে ফিরে আসতেন। ঠাকুরও কখনো কখনো দিনের বেলা ওই চালাঘরে আসতেন

কিন্তু রাতে নিজস্থানে ফিরে যেতেন। একমাত্র এক বর্ষার দিনে ঠাকুর মুষলধারে বৃষ্টিতে ওই চালা থেকে নিজস্থানে ফিরতে না পেরে সেখানেই শুয়ে পড়লেন, আর ঠাট্টা করে মাকে বললেন, 'কালীর বামুনরা রাত্রে বাড়ি যায় না? এ যেন আমি ভাই এসেছি।'এই চালাতে মা বেশিদিন থাকতে পারেননি। ঠাকুরের আমাশা হওয়ায় তাঁর সেবার জন্য মাকে নহবতে আসতে হয়। ঠাকুরের পক্ষে তখন ঘন ঘন ঝাউতলায় শৌচে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ায় নহবতের দিকে লম্বা বারান্দার ধারে একটা কাঠের বাক্সে গর্ত করে নীচে সরা পেতে শৌচের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন বহুদিন এতই ভুগেছিলেন যে, মায়ের ভাষায় 'বাহ্যে গিয়ে গিয়ে মলদ্বার হেজে গেছে।' মা'র একনিষ্ঠ সেবায় ঠাকুর সুস্থ হলে মা জয়রামবাটী ফিরে যান।

চতুর্থবারে ফাল্গুন-চৈত্র মাস (১২৮৭) মা দক্ষিণেশ্বরে এলে হৃদয়ের দুর্ব্যবহারে তৎক্ষণাৎ বিদায় নেন। হৃদয় মথুরানাথের নাতনিকে কুমারী রূপে পূজা করার অপরাধে (জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৮) মন্দিরোদ্যান থেকে বিতাড়িত হন। কিছুদিন পর ঠাকুর কামারপুকুরের লক্ষ্মণ পাইনকে দিয়ে মাকে সংবাদ পাঠালেন, 'এখানে আমার কষ্ট হচ্ছে, রামলাল মা-কালীর পূজারি হয়ে বামুনদের দলে মিশেছে, এখন আমাকে আর অত খোঁজ করে না। তুমি অবশ্য আসবে, ডুলি করে হোক, পালকি করে হোক; দশ টাকা লাগুক, বিশ টাকা লাগুক— আমি দেব।' এই আহ্বান পেয়ে মা এক বছর পরে পঞ্চমবার দক্ষিণেশ্বরে এলেন (মাঘ বা ফাল্গুন, ১২৮৮)। এরপর ১২৯০ সালের মাঘমাসে দক্ষিণেশ্বরে আসেন। কিন্তু বৃহস্পতিবারের বারবেলায় বের হয়েছিলেন তাই ঠাকুরের কথায় পরদিনই মা যাত্রা বদলাতে চলে যান।

এরপরে মা কবে দক্ষিণেশ্বরে আসেন এবং কবে গ্রামে যান, তা অনিশ্চিত। তবে ১২৯১ সালে ভাশুরপো রামলালের বিবাহে তিনি কামারপুকুরে যান এবং ওই বছর ফাল্গুন মাসে দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আসেন। এই সময় থেকে ঠাকুরের লীলাবসান পর্যন্ত মা দক্ষিণেশ্বরে, শ্যামপুকুর ও কাশীপুরেই কাটিয়েছিলেন।

শম্ভু মল্লিকের তৈরি করা চালাঘরে মায়ের কথাতে, 'ঠাকুরের সেবার জন্যে যখন নহবতখানায় ছিলাম, তখন কী কষ্টেই না ছোটো ঘরখানিতে থাকতে হতো। তারই ভিতর কত সব জিনিসপত্র। কখনো কখনো একাও ছিলাম। মধ্যে মধ্যে গোলাপ, গৌরী দাসী, এরা সব থাকত। ওইটুকু ঘর, ওরই মধ্যে রান্না, থাকা, খাওয়া সব। ঠাকুরের রান্না হতো, প্রায়ই পেটের অসুখ ছিল কিনা, কালীর ভোগ সহ্য হতো না। অপর সব ভক্তদের রান্না হতো। লাটু ছিল; রাম দত্তের সঙ্গে রাগারাগি করে এল। ঠাকুর বললেন, ' এ ছেলেটি বেশ, ও তোমার ময়দা ঠেসে দেবে।' দিন রাত রান্নাই হচ্ছে। এই হয়তো রাম দত্ত এল; গাড়ি থেকে নেমেই বলছে, 'আজ ছোলার ডাল আর রুটি খাব।' আমি শুনতে পেয়েই এখানে রান্না চাপিয়ে দিতুম। তিন-চার সের ময়দার রুটি হতো। রাখাল থাকত; তার জন্য প্রায়ই খিচুড়ি হতো। সুরেন মিত্তির মাসে মাসে ভক্তসেবায় দশ টাকা করে দিত। বুড়ো গোপাল বাজার করত। প্রথম প্রথম ঘরে (নহবতের) ঢুকতে মাথা ঠুকে যেত। একদিন কেটেই গেল। শেষে অভ্যেস হয়ে গেছিল। দরজার সামনে গেলেই মাথা নুয়ে আসত। কলকাতা হতে সব মোটাসোটা মেয়েলোকেরা দেখতে যেত, আর দরজার দুদিকে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বলত, 'আহা, কী ঘরেই আমাদের সতীলক্ষ্মী আছেন গো—যেন বনবাস গো'। রাত চারটায় নাইতুম। দিনের বেলায় বৈকালে সিঁড়িতে একটু রোদ পড়ত, তাইতে চুল শুকাতুম। তখন মাথায় অনেক চুল ছিল। নীচের একটু খালি ঘর (নহবতের), তা আবার জিনিসপত্রে ভরা। উপরে সব শিকে ঝুলছে। রাত্রে শুয়েছি, মাথার উপর মাছের হাঁড়ি কলকল করছে, ঠাকুরের জন্য শিঙ্গি মাছের ঝোল হতো কি না শৌচ আর নাওয়ার জন্যই যা কষ্ট হতো। বেগ ধারণ করে করে শেষে পেটের রোগ ধরে গিয়েছিল। দিনের বেলায় দরকার হলে রাত্রে যেতে পারতুম— গঙ্গার ধারে, অন্ধকারে। কেবল বলতুম 'হরি, হরি, একবার শৌচে যেতে পারতুম'। আর ওই মেছুনিরা ছিল আমার সঙ্গী। তারা গঙ্গা নাইতে এসে ওই বারান্দায় চুবড়ি রেখে সব নাইতে নাবত; আমার সঙ্গে কত গল্প করত। আবার যাবার সময় চুবড়িগুলি নিয়ে যেত। রাতে জেলেরা সব মাছ ধরত আর গান গাইত, শুনতাম।'

মা থাকতেন নহবতের নীচের ঘরে আর রান্না করতেন সিঁড়ির নীচে। তিনি দিনেরবেলা বাইরে আসতেন না। নহবতে তাঁর দিনযাপন যোগীন-মা এরূপ বর্ণনা করেছিলেন : 'শ্রীমা ভোর চারটার আগে শৌচ ও স্নানাদি সেরে ধ্যানে বসতেন, ঠাকুর ধ্যান করতে বলতেন কিনা! এর পরে বাকি কাজকর্ম সেরে পূজায় বসতেন। পূজা, জপ, ধ্যান, এতে প্রায় দেড়ঘণ্টা কেটে যেত। তারপর সিঁড়ির নীচে রান্না করতে বসতেন। রান্না হলে যেদিন সুযোগ ঘটত, সেদিন মা নিজ হাতে ঠাকুরকে স্নানের জন্য তেল মাখিয়ে দিতেন। সাড়ে দশটা এগারটার মধ্যে ঠাকুর আহার করতেন। তিনি স্নানে যেতেন, মা এসে তাড়াতাড়ি পান সেজে নজর রাখতেন ঠাকুর স্নান করে ফিরে এলেন কিনা। তিনি তাঁর ঘরে এলেই মা এসে জল ও আসন দিয়ে তারপরে খাবারের থালা নিয়ে এসে তাঁকে আহারে বসিয়ে নানা কথার মধ্য দিয়ে চেষ্টা করতেন, যাতে খাবার সময় ভাবসমাধি উপস্থিত হয়ে আহারে বিঘ্ন না ঘটায়।

একমাত্র মা-ই খাবারের সময় তাঁর ভাবসমাধি আসা অনেকটা ঠেকিয়ে রাখতে পারতেন, আর কারও সে সাধ্য ছিল না। ঠাকুরের খাওয়া হলে মা একটু কিছু মুখে দিয়ে জল খেয়ে নিতেন। পরে পান সাজতে বসতেন। পান সাজা হয়ে গেলে গুনগুন করে গাই গাইতেন; তা খুব সাবধানে, যেন কেউ না শুনতে পায়। এর পরে কলের সেই একটার বাঁশি বেজে উঠত, যাকে ঠাকুরের মা বৃন্দাবনে কৃষ্ণের বাঁশি বলতেন, তাই শুনে তিনি খেতে বসতেন। সুতরাং দেড়টা দুটোর আগে কোনো দিনই মায়ের খাওয়া হতো না। আহারের পরে নামমাত্র একটু বিশ্রাম করে সিঁড়িতে চুল শুকোতে বসতেন তিনটে নাগাদ। তারপর আলোটালো ঠিক করে তোলা-জলে নমো নমো করে মুখ হাত ধুয়ে কাপড় কেচে সন্ধ্যার জন্য প্রস্তুত হতেন। সন্ধ্যা এলে আলো দিয়ে ঠাকুরদেবতার সামনে ধুনো দেখিয়ে মা ধ্যানে বসতেন। এরপরে রাত্রের রান্না; সকলকে খাওয়ানো সেরে মা আহার করতেন। তারপর একটু বিশ্রাম করে শুয়ে পড়তেন।'

একদিন অন্ধকারে স্নানের জন্য সিঁড়ি দিয়ে গঙ্গায় নামতে গিয়ে মা এক কুমিরের গায়ে প্রায় পা দিয়ে ফেলেছিলেন। কুমিরটা সিঁড়ির উপর শুয়েছিল। মায়ের পায়ের শব্দ শুনে জলে লাফিয়ে পড়ে। সেই থেকে মা সর্বদা আলো নিয়ে স্নানে যেতেন। মায়ের কিন্তু এই সব ক্লেশ বা অসুবিধার প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ ছিল না। পরবর্তীকালে সমস্ত কষ্টের কথা উল্লেখ করেও তিনি ভক্তদেরকে বলতেন, 'তবু আর কোনও কষ্ট জানিনি। তাঁর সেবার জন্য কোনো কষ্টই গায়ে লাগত না। কোথা দিয়ে আনন্দে দিন কেটে যেত।' □

সবার মা

সুনন্দিনী শুক্লা

নিমনিমে অন্ধকার নেমে এসেছে। বাগানের ঝোপগুলিতে মশার ঝাঁক বিনবিন করছে। এই আধো আলো আধো অন্ধকারে শিউলিতলার ঝোপে জোনাক জ্বলছে থরে থরে। দূরে গ্রামের প্রান্তসীমার দিকে চোখ ফেরালে দেখা যায় নীলচে ধোঁয়া, উনুনে আঁচ পড়ছে। ঘরে ঘরে মঙ্গলশঙ্খ বাজছে, গৃহিণীরা তুলসীতলায় প্রদীপ দিচ্ছেন। গ্রামের ঘরে ঘরে চিঁড়ে মুড়ি ভাজা হচ্ছে। খোকারা মাঠ থেকে ফিরে আঁক কষতে বসেছে।

এই ছোটো বাড়িটিতে লোকসমাগম লেগেই আছে। কলকাতা থেকে তো বটেই, গ্রামবাঙ্গলার নানা স্থান থেকে সর্বস্তরের মানুষ এই বাড়িতে আসেন। কারণ এখানে একজন 'মা' থাকেন। তাঁকে দেখতেই আসা। তাঁর কাছেই আসা। এইটুকু বাড়িতে ঘর-বার মিলিয়ে কী করে যেন সবার জায়গা হয়ে যায়। এইটুকু হেঁশেলে কী করে যেন সবার দু'মুঠো অন্ন জুটে যায়। মা প্রায় শূন্য হাঁড়িতে হাত ঘুরিয়ে ঠিক বের করে আনেন দু'মুঠো চাল। যারা নিয়মিত আসেন তাদের খাওয়াদাওয়া রকমসকম, সব মায়ের জানা। কারও ঝাল, কারও ঝোল, কারও অম্বল।

তারা এলেই মা ঘটি নিয়ে দুধ আনতে বেরোন। ছেলে কলকাতার লোক, চা খাওয়ার অভ্যেস। এই গ্রামেগঞ্জে ওসবের তো চল নেই, কিন্তু ওদের অসুবিধে হওয়া চলবে না। দুপুর রোদে পিঠ দিয়ে মা নারকেল কোরান, শিরা ওঠা হাতে সরুচাকলি তৈরি করেন। দুপুরে লম্বা দাওয়ায় লাইন দিয়ে পাত পড়ে। সোজা সরল রেখায় সবকটি পাতা রাখা বামদিকে জলের গ্লাস! খাওয়ার শেষে সকলের এক হাতা করে জোটে সেই অমৃত। সবাই যখন খেয়ে ওঠেন, মা তখন খেতে বসেন। কখনো পা ছড়িয়ে আঁচলে গুঁড়ানো মুড়ি নিয়ে বসে চিবোন।

মায়ের পায়ের তলা রক্তরাঙা। মাঝখানে একটি সুন্দর পদ্মচিহ্ন আছে। যখন মা ভিজে পায়ে দাওয়ায় ওঠেন, সেই জলছাপ দেখতে ভারী সুন্দর লাগে। বাতের বড়ো ব্যথা! কোয়ালপাড়া থেকে পরের মাসে আয়ুর্বেদিক তেলটা এলে একটু আরাম হবে।

সারাদিন কাজের মধ্যে চলে নিরন্তর জপ। সন্ধ্যেবেলা প্রদীপের আলোয় ঘরের মধ্যে বসে দেবতা ও গুরুস্বরূপ স্বামীর ছবিটির দিকে চেয়ে থাকেন। দুজনের মধ্যে তখন বার্তালাপ হয়, সেকথা সাধারণে শুনতে পায় না।

ওই যে, এখন এই ঝুপসি আঁধারে শিউলিতলায় একটা সাদা অবয়ব নড়ছে চড়ছে! ওটি মা! নীচু হয়ে কী করছেন তিনি? কিছুই না, ধারালো ইটের খোলাগুলি সরিয়ে রাখছেন। এ বাড়িতে তাঁর অগণিত ছেলে-মেয়ে আসে। কার পা কেটে রক্তারক্তি হবে! তাই বাতের ব্যথা উপেক্ষা করে স্বহস্তে তিনি এই কাজ করছেন। মা কাজকর্ম করেন নিপুণভাবে। যত্ন করে। মা বলেন— 'ঝাঁটাটিকেও মান্য করতে হয়।'

তিনি গিরিশ ঘোষকে নিশ্চয় করে বলেছেন— 'আমি গুরুপত্নী নই, পাতানো মা নই, কথার কথা মা নই, সত্য জননী।' তিনি জানিয়েছেন তিনি পিঁপড়েটিরও মা।

তাঁর এই প্রত্যয়ের কারণে নরেন্দ্রনাথ যখন বিদেশ যাত্রা করছিলেন তখন শত সামাজিক বাধা সত্ত্বেও, কেবলমাত্র তাঁরই উপর ভরসা রেখেছিলেন। তাঁর পত্রে সম্মতি পেয়ে তিনি নির্ভয়ে যাত্রা করেছিলেন, কারণ তিনি জানেন মা তার সঙ্গে আছেন। ফিরে এসে তাই সর্বপ্রথম মায়ের কাছে গিয়েছিল তাঁর ছেলে। বলেছিল— মা, এই যুগে আপনার আশীর্বাদে একেবারে হুপ করে ওদেশে গিয়ে পড়লুম।

মা হলে লজ্জা ঘৃণা ভয় ত্যাগ করতে হয়। তাই তিনি নির্ভয়ে সামাজিক সংস্কার দূরে সরিয়ে স্বহস্তে সন্তানের এঁটো পরিষ্কার করেন। সমাজ মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠে— 'ও কী করছ মা। বামুনের মেয়ে হয়ে ছত্রিশ জাতের এঁটো কুড়োচ্ছ!' মা মায়ের মতোই উত্তর দেন— 'ছত্রিশ কোথা বাবা। সব যে আমার।'

তাঁর সাধক স্বামী তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন— 'কালে কালে তোমার এত ছেলে হবে যে মা ডাকে তুমি অস্থির হয়ে উঠবে।' তিনি স্বামীর সেই আশ্বাস বাণীর মর্যাদা রেখেছেন আজীবন।

তিনি সাধারণ মানবী কী মহাসাধিকা, কী 'জগদ্ধাত্রী' তা জানি না', তবে তিনি যে মা এ বিষয়ে সংশয় নাই। সন্তানগতপ্রাণ শ্রীশ্রী মা। সন্তানদের পথের বাধা এভাবে সরানোই তো তাঁর কাজ! তাঁর স্বামী য়ে কর্কটরোগশয্যায় শুয়ে তাঁকে বলে গিয়েছিলেন--- 'কলকাতার লোকগুলোকে একটু দেখো।' তাই তো এখনো শরীরের এত যাতনা সয়েও তিনি 'আছেন'! যতদিন লোকে তাঁকে 'মা' বলে ডাকবে, তিনি তো ধুলোকাদা ঝেড়ে কোলে তুলে নেবেনই। □

জগজ্জননী মা সারদা

মিতা রায়

জগজ্জননী মা সারদা বলেছেন— যেমন ফুল নাড়তে নাড়তে গন্ধ বেরোয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবত তত্ত্ব আলোচনা করতে করতেই তত্ত্ব জ্ঞানের উদয়। আরেকভাবে বলা যায়, বিভিন্ন মহামানবের বাণী, তাদের জীবনী, তাদের তত্ত্ব জ্ঞান, আলোচনা করতে করতেই আমাদের মতো সাধারণ মানুষের সকল সমস্যা সমাধান হয়ে যায়। এই আলোচনায় যা থাকছে তা হয়তো আমরা অনেকেই জানি, তবু সেই মায়ের কথা অনুসারেই বলা যায়, এগুলি যখন আমরা আবার চর্চা করছি হয়তো তখনই মায়ের আশীর্বাদের অধিকারী হয়ে যাব।

জীবজগতের কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রী মা অশেষ ক্লেশ সহ্য করে গেছেন। বর্তমান সমাজে নারী কল্যণের জন্য কত আলোচনা সভা, আন্দোলন হয়, সেখানে যদি শ্রীশ্রীমায়ের জীবনীতে আলোকপাত করা হয়, তাহলে আমাদের বর্তমান পীড়িত নারী সমাজের কল্যাণ অবধারিত। ঠাকুর যখন জীবনের শেষ প্রান্তে শয্যাশায়িত তখন একদিন মায়ের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, হ্যাঁ গো, তুমি কি কিছুই করবে না? মা তখন অসহায় কণ্ঠে বললেন, আমি তো মেয়ে মানুষ, আমি কী করতে পারি? তখন ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে বললেন, না না তোমাকে অনেক কিছুই করতে হবে। যখন ঠাকুরের অন্তিম অবস্থা, তখন মাকে কাছে পেয়ে ঠাকুর কাতর কণ্ঠে বললেন, দেখো কলকাতার মানুষগুলো কেমন অন্ধকারে পোকার মতো কিলবিল করছে। তুমি তাদের দেখো। জননী সারদা আগের মতোই বললেন, আমি তো মেয়ে মানুষ, আমি কি করতে পারি? এবার ঠাকুর নিজের শরীর দেখিয়ে শ্রীশ্রী মাকে আপন করে বললেন, এ আর কী করেছি, তোমাকে এর থেকেও অনেক বেশি করতে হবে।

পরবর্তী জীবনে ঠাকুরের একথা মিলে গিয়েছিল অক্ষরে অক্ষরে। শ্রী মা একবার নিজেই বলেছিলেন ঠাকুর যখন চলে গেলেন, তখন আমারও মনে হচ্ছিল আমিও যাই কিন্তু তখন তিনি দেখা দিয়ে বললেন, না, তুমি থাকো। অনেক কাজ বাকি আছে। শেষে দেখলাম তাই তো, অনেক কাজ বাকি আছে। ঠাকুর চলে গেলেন। মা তখন একা। কামারপুকুরে ঠাকুরের নির্দেশে মা বৈধব্য বেশ ধারণ করতেন না। হাতে বালা আর সরু লালপেড়ে সাদা শাড়িতে মা আবৃত থাকতেন। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর শোক ভুলে থাকার জন্য মা তার চিরসঙ্গিনী গোলাপ মা, লক্ষ্মী দেবী, যোগেন মহারাজ, লাটু মহারাজ, মাস্টারমশায়ের স্ত্রী, কালী মহারাজ ওদেরকে নিয়ে তীর্থ দর্শনের উদ্দেশ্যে দেওঘর গেলেন। সেখানে বৈদ্যনাথ দর্শন করে কাশিতে গেলেন। সেখানে এক সন্ধ্যায় প্রভু বিশ্বনাথের আরতি দর্শন করতে গিয়ে মা অস্বাভাবিক পদক্ষেপে বাড়ি ফিরলেন। পরে মা স্বাভাবিক হয়ে বললেন, ঠাকুর আমাকে হাত ধরে মন্দির থেকে থেকে নিয়ে এলেন। কাশী থেকে গেলেন শ্রীরামচন্দ্রের লীলাভূমি অযোধ্যা দর্শন করতে। সেখান থেকে গেলেন বৃন্দাবন। বৃন্দাবনে গিয়ে ঠাকুরকে যেন মা নতুন করে পেলেন। মায়ের দেহ মনে দেখা গেল এক নতুন আবেশ। মাঝে মধ্যে যমুনার তীরে চলে যেতেন। একটা যমুনার বালুকা তীরে এক কিশোরীর মতো ঘুরে বেড়াতেন। সঙ্গীসাথীরা তাকে খুঁজে খুঁজে নিয়ে আসতেন। এই বৃন্দাবনে শ্রীশ্রী মা এক বছর কাটিয়েছেন।

পরবর্তীতে আরও তীর্থস্থান ঘুরে প্রয়াগে ঠাকুরের চিতাভস্ম গঙ্গা-যমুনা সরস্বতীর ত্রিবেণী সঙ্গমে ভাসিয়ে কলকাতায় ফিরলেন। তারপর গেলেন কামারপুকুরে। ঠাকুরের নির্দেশ মতো বৈধব্যের বেশ না ধরায় পাড়ার বয়স্কদের কটু কথার শিকার হয়েছিলেন মা। যা থেকে আমাদের বর্তমান সমাজ এখনো মুক্ত হতে পারেনি। সেই মা-ও একসময় অত্যন্ত মানসিক কষ্ট পেয়ে খুলে ফেলতে চেয়েছিলেন হাতের বালা। কিন্তু ঠাকুর আবার দেখা দিয়ে বললেন, বৈষ্ণব মতে তিনি বিধবা নন। তার স্বামী চিন্ময়। তাছাড়া শ্রীশ্রী মা হচ্ছেন স্বয়ং লক্ষ্মী। সেই লক্ষ্মী যদি নিরাভরণা হন তাহলে জগৎ হবে লক্ষ্মীহীনা। পরবর্তীতে মা আর কখনো বালা খোলেননি এবং আজীবন সরু লাল পেড়ে সাদা শাড়ি পরিহিতা ছিলেন।

ঠাকুর চলে যাবার পর মায়ের মধ্যে ধ্যানের গভীরতা খুব বেড়ে গিয়েছিল। একদিন বলরামবাবু বাড়িতে ধ্যান করতে করতে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। ধ্যান ভঙ্গ হলে তার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠা যোগিন মাকে বলেছিলেন, 'দেখলুম কোথায় যেন চলে গিয়েছি। সেখানে সবাই আমাকে কত আদর করছে, আমার খুব সুন্দর রূপ হয়েছে, সেখানে ঠাকুর রয়েছেন, তার পাশে আমাকে বসতে দিয়েছেন। সে যে কী আনন্দ তা বলে বোঝাতে পারবো না। একটু হুঁশ ফিরতেই দেখি, আমার বিশ্রী শরীরটা পড়ে রয়েছে। ওই বিশ্রী শরীরে আমার ঢুকতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। অনেক পরে ওটাতে ঢুকতে পারলাম।' মায়ের গঙ্গাভক্তি ছিল অটল। গঙ্গা ঘাটের কাছেই নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির একাংশে মা ভাড়া নিলেন। সেই নির্জন পরিবেশে মায়ের থাকার ব্যবস্থা হলো। গোলাপ মা, যোগিন মা রইলেন মায়ের সঙ্গিনী হিসাবে। সেবক রূপে মায়ের দায়িত্ব নিলেন স্বামী যোগানন্দ। মায়ের ধ্যান, জপ, নির্বিকল্পতা, ত্যাগী স্বরূপা মা সেখানে ৬ মাস রইলেন। তাঁর এই আত্মত্যাগে মহিমময় এই স্থান পরিণত হলো এক তীর্থস্থানে। যা পৃথিবীর বুকে আজ বেলুড় মঠ নামে পরিচিত। আর বর্তমান এই নিষ্ঠুর পরিস্থিতিতে মায়ের চরণই আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল। □

মাউন্ট এলব্রুস জয় করলেন বাঙ্গালি বিজ্ঞানী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আফ্রিকার সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট কিলিমাঞ্জারো জয় করেছিলেন এ বছরের জুলাই মাসে। তার দেড় মাস পরেই রাশিয়া ও ইউরোপের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট এলব্রুস জয় করলেন ব্যাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স (আইআইএসসি) -এর কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড অটোমেশন ডিপার্টমেন্টের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ও বিজ্ঞানী ড. অর্পিতা পাত্র। গত ৩১ আগস্ট তিনি বিশ্বের দশম উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট এলব্রুস জয় করেছেন। পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ার হাউরের বাসিন্দা ড. অর্পিতা পাত্র। প্রথম মহিলা বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি ইতিমধ্যেই জয় করেছেন আফ্রিকার সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ তানজানিয়ায় অবস্থিত মাউন্ট কিলিমাঞ্জারো। একটি নিম্নবিত্ত পরিবারের কন্যা অর্পিতার কাছে পড়াশোনা ছিল সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। ছাত্রজীবনে অঙ্ক ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। কম্পিউটার সায়েন্সে বি.টেক ডিগ্রি অর্জনের পর তিনি স্নাতকোত্তর পাশ করেন এবং পিএইচডি সম্পূর্ণ করেন।

এ বছর এপ্রিল মাসে সিকিমের গোচালায় ১০ দিনের ট্রেকিঙের মধ্য দিয়ে অর্পিতার পর্বতারোহণের শুরু। এরপরই তিনি আফ্রিকার সর্বোচ্চ শৃঙ্গে আরোহণের সিদ্ধান্তগ্রহণ করেন। সেই শৃঙ্গ জয়ও করেন। মে থেকে শুরু হয়ে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত রাশিয়ায় চলে পর্বতারোহণ। কিলিমাঞ্জারো জয়ের পর বিশ্বের দশম উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট এলব্রুস জয়ের জন্য ২০২৫ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি হননি তিনি। সেই অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে ৪০ বছর বর্ষীয়া বাঙ্গালি বিজ্ঞানী বলেন,ট্রেকটি ছিল রীতিমতো চ্যালেঞ্জিং। রাশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে এই মুহূর্তে রয়েছে যুদ্ধ পরিস্থিতি। এরই সঙ্গে তাঁর জ্বর থাকার পাশাপাশি গ্লুটিয়াল পেশি ও টেলবোনে একটি দুর্ঘটনাজনিত আঘাতও ছিল। এই পরিস্থিতিতে টিকিট বুকিং হয় এবং তিনি রাশিয়া যাওয়ার সিদ্ধান্তে অবিচল থাকেন। তিনি আরও বলেন যে প্রতিটি পর্বতশৃঙ্গের পরিবেশ-পরিস্থিতি ভিন্ন, এবং এই ধরনের বড়ো ট্রেকিঙের ক্ষেত্রে সেই পরিবেশের সঙ্গে অ্যাক্লিমাটাইজেশন বা শারীরিক-মানসিকভাবে মানিয়ে নেওয়ার গুরুত্বটা সর্বাধিক। এই কারণে মাউন্ট কিলিমাঞ্জারোর শৃঙ্গটি জয় করতে তাঁর সময় লাগে সাতদিন। কিন্তু মাত্র একদিনেই মাউন্ট এলব্রুসের শৃঙ্গটি জয়ে তিনি সমর্থ হন। সর্বকনিষ্ঠ পর্বতারোহী হিসেবে সেভেন সামিট এবং ভলকানিক সেভেন সামিট বিজেতা, গিনেস বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী সত্যরূপ সিদ্ধান্ত একাধারে বিজ্ঞানী ও পর্বতারোহী ড. অর্পিতা পাত্রের প্রশিক্ষক ও পরামর্শদাতা। এ বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে আর্জেন্টিনার আকোংকাগুয়া ও অস্ট্রেলিয়ার মাউন্ট কোসিয়াস্কো পর্বতচূড়া দু'টি জয়ের পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। উত্তর আমেরিকায় অবস্থিত মাউন্ট ডেনালি এবং ইউরোপে অবস্থিত মন্ট ব্লঁ শৃঙ্গ দু'টি ২০২৫ সালে জয়ের কথা ভেবেছেন তিনি। ২০২৬ সালে এশিয়ার মাউন্ট এভারেস্ট এবং অ্যান্টার্কটিকায় অবস্থিত মাউন্ট ভিনসন শৃঙ্গ দু'টি জয়ের স্বপ্ন রয়েছে তাঁর।

'গোরা এলব্রুস' নামেও পরিচিতি রয়েছে মাউন্ট এলব্রুসের। এটি একটি বিলুপ্তপ্রায় আগ্নেয়গিরি। অন্তত ২৫ লক্ষ বছর আগে যার সৃষ্টি। মাউন্ট এলব্রুসের দু'টি শৃঙ্গের উচ্চতা ১৮,৫১০ ফুট (৫,৬৪২ মিটার) এবং ১৮,৩৫৬ ফুট (৫,৯৯৫ মিটার)। এহেন পর্বতশৃঙ্গতে ওঠার শেষ দিন ছিল গত ৩১ আগস্ট। মরসুম শেষ হলে ফের তা চালু হতো দশ মাস পর। তাই অত্যন্ত খারাপ আবহাওয়া এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও মনের জোরে এই শৃঙ্গ জয় করেন অর্পিতা। এই অভিযাত্রী দলে ড. অর্পিতা পাত্র ছাড়াও ছিলেন বেঙ্গালুরুর শ্রীনিবাসন রামমূর্তি এবং গাইড পাভেল চার্নভ। 'উইনার্স অ্যান্ড অ্যাচিভার্স' সংস্থার উদ্যোগে তাঁদের এই অভিযান সংগঠিত হয়। অর্পিতা জানান, গত ২৬ আগস্ট তাঁরা রাশিয়া পৌঁছান, কিন্তু হঠাৎ প্রচণ্ড জ্বরে কাহিল হয়ে পড়েন তিনি। টানা দু'দিন ঘরেই আটকে থাকতে হয়। পুরো মিশন বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলেও গাইডের পরামর্শে গত ২০ আগস্ট রাত একটায় মাউন্ট এলব্রুস পর্বতশৃঙ্গে ওঠা শুরু করেন। সেসময় ছিল প্রচণ্ড ঠাণ্ডা এবং ঝোড়ো হাওয়া। সবকিছু উপেক্ষা করে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ জয় করে, অবশেষে গত ৩১ আগস্ট সকাল ৮টা ৪৫ মিনিটে জয় করেন মাউন্ট এলব্রুস। এই খবরে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তাঁর স্বামী ড. আশিস চৌধুরী এবং অন্যান্য শুভানুধ্যায়ীরা। সমস্ত বাধাবিঘ্ন জয় করে বিদ্যার্জন, শিক্ষালাভের পর একজন বিজ্ঞানী হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ এবং বর্তমানে একজন অসীম সাহসী, সফল পর্বতারোহী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা ড. অর্পিতা পাত্র তরুণ প্রজন্মের সকলের কাছে আদর্শস্বরূপা। □

মিনুর ফিরে আসা

মিনু আর রানু যেন দুই বন্ধু। দুইজনের কেউ কাউকে ছাড়া থাকতে পারে না। খাওয়াদাওয়া, ঘুম, এমনকী কোথাও ঘুরতে যাওয়া, সবসময়ই একসঙ্গে। যদিও তাদের বয়সের পার্থক্য প্রায় ৮ বছরের। যেদিন

রানুর ৬ বছরের জন্মদিন পালন হচ্ছিল, সেইদিন অনুষ্ঠান শেষে সমস্ত বন্ধু, আত্মীয়স্বজনদের বিদায় জানিয়ে বাইরের দরজাটা বন্ধ করতে যাবে তখন রাস্তার ধারে পড়ে থাকতে দেখে এই মিনুকে। সেসময় বড়ো জোর একমাস বয়স হবে। রানু নিজে তাকে কোলে তুলে ঘরে আনে। নিজে হাতে গরম দুধ চামচ দিয়ে খাইয়ে দেয়। দুধ খেয়ে বাচ্চাটা যেন একটু শক্তি ফিরে পায়। পরেরদিনই নিজের নামের সঙ্গে মিলিয়ে নাম রাখে মিনু।

আজ প্রায় দু'বছর হতে চলল তাদের সেই বন্ধুত্ব একটুও কমেনি। যতই দুষ্টুমি করুক, রানুর জন্যই বাড়ির কেউ তাকে বকতে পারে না। কিন্তু যতদিন যাচ্ছে মিনুর দুষ্টুমি বেড়েই চলেছে। খাবারে মুখ দেওয়া, জলের গ্লাস ফেলে দেওয়া, ভাঁজ করা কাপড় ছড়িয়ে দিয়ে তার মধ্যেই শুয়ে যাওয়া।

এই দুষ্টুমি কিন্তু রানুর বাবা-মায়ের আর সহ্য হচ্ছে না। রানু একদিন ঘুমিয়ে গেলে রানুর মা বাবা আলোচনা করে ঠিক করে

মিনুকে দূরে কোথাও রেখে আসার জন্য। তা নাহলে মেয়ের পড়াশোনা ঠিক মতো হচ্ছে না, সারাদিনই শুধু মিনুর সঙ্গে খেলা। সেই মতো একদিন রানু স্কুলে যেতেই তার বাবা মিনুকে একটা ব্যাগে ভরে নিয়ে চলে যায়।

বিকাল বেলায় রানু এসে ঘরে বাইরে কোথাও মিনুকে দেখতে না পেয়ে মাকে জিজ্ঞেস করে কিন্তু মা তাকে কোনো উত্তর দেয় না। সন্ধ্যাবেলায় বাবাকেও জানায় কিন্তু তিনিও পড়তে বসতে বলে নিজের কাজ করতে থাকেন।

আজ আর রানুর পড়ায় মন বসছে না। মাঝে মধ্যেই এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। খাওয়াতেও তার মন নেই। অল্প খেয়েই উঠে পড়ল। মা তাকে বলল, খাবার ছেড়ে উঠতে নেই, পুরো খাবারটা শেষ কর। কিন্তু কোনো কথাই তার কানে গেল না। মুখ ধুয়ে জানালার পাশে গিয়ে বসল। কিছুক্ষণ পর মা তাকে প্রায় জোর করেই বিছানায় নিয়ে গেল, কিন্তু ঘুম যেন কোথায় হারিয়ে গেছে।

এভাবেই দুইদিন কেটে গেল। রানুর মুখের হাসি কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। কথাও বলে না, ঠিক করে খায়ও না। এইসব দেখে মায়ের চোখেও জল চলে এসেছে। তার বাবাও সব বুঝতে পেরেছে। মিনুকে ছাড়া রানু যে ভালো থাকবে না, তা তারা বুঝতে পেরেছেন।

পরেরদিন তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া সেরে রানুর বাবা কাজে বেরিয়ে গেলেন। রানুও স্নান, খাওয়াদাওয়া করে স্কুলে চলে গেল। বিকালে স্কুল থেকে ফিরে ঘরে ঢুকেই দেখে, তার বইপত্র এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে। জামাকাপড়ও বিছানার উপর এলোমেলোভাবে রয়েছে। ঘর থেকে বেরিয়েই মাকে একটু রাগ দেখিয়েই জিজ্ঞেস করল, 'আমার বইপত্র, জামাকাপড় এইভাবে কে ছড়িয়েছে?' তার মা হাসিমুখে বলে, 'তোর প্রিয় বন্ধু।' আজ রানুর বাবাও তাড়াতাড়ি কাজ থেকে ফিরেছেন। বাবাকে জিজ্ঞেস করলেও একই উত্তর পেল। কিছুটা বিরক্ত হয়েই সে ঘরে চলে গেল।

ঘরে গিয়ে নিজের জামাটা উঠাতে গিয়েই চমকে গেল, এ কী সত্যিই নাকি স্বপ্ন! এ যে তার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু মিনু। জামাকাপড়ের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে। মিনু, ও মিনু– রানু ডাক দিল। প্রিয় বন্ধুর আওয়াজে মিনুর ঘুম ভেঙে গেল। তার কটা কটা চোখে যেন চমক দেখা গেল। ধবধবে সাদা ছোট্ট মিনু একলাফে রানুর কোলে গিয়ে বসল। আর লেজটা নেড়ে আদর ডেকে উঠল— মিঁও।

সোমকান্তি

জাতীয় উদ্যান

রাইমোনা

অসম রাজ্যের একেবারে উত্তর-পশ্চিম অংশে ভুটান-ভারত সীমান্তে কোকরাঝার জেলায় রাইমোনা ন্যাশনাল পার্ক অবস্থিত। এটি গোসাইগাঁও ও কোকরাঝার মহকুমা জুড়ে বিস্তৃত। এই উদ্যানটি অসম রাজ্যের সবচেয়ে জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ বনাঞ্চল। সোনালি লাঙ্গুলের জন্য বিখ্যাত। এছাড়া এশিয়ান হাতি, বাঘ, মেঘবর্ণ চিতাবাঘ, গৌড়, চিতল হরিণ, সম্বর হরিণ,বন্য কুকুর, কালো ভল্লুকের বাসভূমি। রয়েছে ১৫০ প্রজাতির প্রজাপতি, ১৯০ প্রজাতির পাখি এবং ৩৮০ প্রজাতির গাছপালা ও অর্কিড। জীববৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য এই উদ্যান বিশ্ব মানচিত্রে স্থান করে নিয়েছে।

এসো সংস্কৃত শিখি– ৪৭

অকারান্ত ক্লীবলিঙ্গে

একবচনম্-বহুবচনম্।

পুস্তকম্-পুস্তকানি।

একটি বই–অনেকগুলি বই।

সোপানম্-সোপানানি।

একটি সিঁড়ি–অনেকগুলি সিঁড়ি।

অভ্যাস কুর্মঃ-

বাতায়নম্-বাতায়নানি, মুখম্-মুখানি, মস্তকম্-মস্তকানি,ফলম্-ফলানি, গীতম্-গীতানি, আসনম্-আসনানি, কাগদম্-কাগদানি **যদি আগে ঋ/র/ষ থাকে তবে ক্লীবলিঙ্গে ণ হবে। যেমন–**

গৃহম্-গৃহাণি,পত্রম্-পত্রাণি,ছত্রম্-ছত্রাণি।

কিন্তু আগে ঋ/র/ষ না থাকে তবে ন হবে। যেমন–

ফলম্-ফলানি, ধনম্-ধনানি, শাকমৃশাকানি।

প্রযোগং কুর্মঃ-

দ্বারম্ বস্ত্রম্, পুষ্পম্,ভবনম্, ফেনকম্, যানম্, মন্দিরম্।

ভালো কথা

প্রজাপতি

শুয়োপোকা দেখলে আমার গা রি রি করে। ওদের শুয়ো গায়ে লাগলে গা জ্বালা করে। তাই শুয়োপোকা দেখলেই আমি মেরে ফেলি। একদিন দেখি আমাদের বাগানে দুটো সজনে গাছের গোড়ায় অসংখ্য শুয়োপোকা। আমি বাবাকে বললাম ওগুলো মেরে ফেলতে হবে। বাবা বললেন, না, ওগুলো থেকেই প্রজাপতি হবে। কদিন পরে দেখি সজনেগাছের গোড়ায় আর শুয়োপোকা নেই। একমাস পরে দেখি আমাদের বাগানে অসংখ্য প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে। কী সুন্দর দেখতে ওদের। বাবা্ বললেন, ওই শুয়োপোকাগুলোই প্রজাপতি হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে।

স্নেহা দত্ত, চতুর্থ শ্রেণী, ঝালদা নামোপাড়া, পুরুলিয়া

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

ভারতবর্ষ

রণবীর খাঁ, ষষ্ঠশ্রেণী, দেশবন্ধু রোড, পুরুলিয়া

ভারত ছিল বিশাল বড়ো
আর শক্তিশালী দেশ,
তার গুণের কথা বলে বলে
হতো না কখনো শেষ।
হিংসা করলো তারা সবাই
ছিল যত ভণ্ড
ভারতবর্ষকে ভেঙে ভেঙে
করলো খণ্ড খণ্ড।

লেখা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা ই-মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0550. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206
9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

লোকশিক্ষিকা মা সারদা

ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের প্রাচীন অধ্যাত্মচেতনায় মাতৃশক্তির সাধনা সুপ্রাচীন। তবে মানবীয় শরীর-মন অবলম্বনে দিব্য মাতৃত্বের সমন্বিত রূপের অভাব এদেশে ছিল, বাস্তব স্নেহশীলা মাতার সঙ্গে জগদীশ্বরীর মানস- চেতনাকে মিলিয়ে দেওয়ায় ছিল অস্বাচ্ছন্দ্য। শক্তিসাধনায় মা সাধকের খুব কাছে এলেও, তিনি আছেন ভাবের জগতে। বাস্তবজগতের ধূলিমলিন বসনা, স্নেহময়ী, এই মায়ের অভাব পূরণ করলেন শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণী শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী। ১৮৫৩ সালের ২২ ডিসেম্বর (বাংলা ১২৬০ সনের ৮ পৌষ) বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটী গ্রামের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে শ্রীশ্রীমা'র জন্ম। পিতা রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কৃষিকাজ ও পুরোহিত বৃত্তি করে সংসার চালাতেন। মাতা শ্যামাসুন্দরী দেবী ছিলেন এক ধর্মপরায়ণা মহিলা। সারদামণি ছিলেন তাদের প্রথম সন্তান। এছাড়াও তাঁদের আরও একটি কন্যাসন্তান (কাদম্বিনী) ও পাঁচটি পুত্রসন্তান (প্রসন্নকুমার, উমেশচন্দ্র, কালীকুমার, বরদাপ্রসাদ ও অভয়াচরণ) ছিল। পল্লীবাঙ্গলার এক সাধারণ মেয়ের মতোই সরল ও সাদামাটা ছিল সারদামণির বাল্যকাল। ভাইদের দেখাশোনা করা, জলে নেমে গোরুর জন্য দলঘাস কাটা, ধানক্ষেতে মুনিষদের জন্য মুড়ি নিয়ে যাওয়া, ধান কুড়ানো— এসব নিয়েই কাটত দিন। মাঝে মাঝে ভাইয়েদের সঙ্গে পাঠশালায় যাওয়ার সূত্রে কিছুটা অক্ষরজ্ঞানও ছিল।

১৮৫৯ সালের মে মাসে, হিন্দু প্রথামতো পাঁচবছর বয়সে কামারপুকুরের গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। তখন গদাধরের বয়স তেইশ। বিয়ের পরেও সারদাদেবী বাবা-মায়ের কাছেই থেকে যান। গদাধর ফিরে যান কামারপুকুরে। চোদ্দো বছর বয়সে সারদামণি কামারপুকুরে আসেন। সেখানে তিনমাস স্বামীর সঙ্গে থাকেন। তখনই ধ্যান ও অধ্যাত্মজীবনের প্রয়োজনীয় নির্দেশ তিনি স্বামীর থেকে পান। গদাধর চট্টোপাধ্যায় দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীর পূজা করে তখন বেশ জনপ্রিয়। সকলে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস জ্ঞানে তাঁকে শ্রদ্ধা করেন। সারদামণির বয়স সতেরো। তিনি শোনেন, তার স্বামী পাগল হয়ে গিয়েছেন, তখন তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসার সিদ্ধান্ত নেন। ১৮৭২ সালের ২৩ মার্চ বাবার সঙ্গে তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসেন। স্বামীকে দেখে তার ভয় ও সন্দেহ অপসারিত হয়। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের নহবতখানার একতলায় একটি ছোট্ট ঘরে তিনি বসবাস করতে শুরু করেন। ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত তিনি এখানেই কাটান।

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মনে করতেন, রামকৃষ্ণদেব তাঁর স্ত্রীর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ মনে করতেন, সতেরো বছর বয়সে স্বামী দর্শনে মা সারদা যখন যান, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে আন্তরিকতার সঙ্গে বরণ করেছিলেন। মিসেস ওলি বুল বলেছিলেন, 'যে স্বামীর সঙ্গে তাঁর বাল্যবিবাহ হয়ে ছিল তাঁকে তিনি যখন সানন্দে তাঁর সন্ন্যাসীজীবন যাপনের সম্মতি দিলেন, অমনি পেলেন তাঁর অন্তরঙ্গতা।' শ্রীমা'র দক্ষিণেশ্বর জীবনের বর্ণনা দিয়েছেন যোগীন মা। তিনি বলেছেন, 'শ্রীমা ভোর চারটার আগে শৌচ ও স্নানাদি সেরে ধ্যানে বসতেন,— ঠাকুর ধ্যান করতে বলতেন কিনা! এরপরে বাকি কাজকর্ম সেরে পূজায় বসতেন। পূজা, জপ, ধ্যান— এতে প্রায় দেড় ঘণ্টা কেটে যেত। তারপর সিঁড়ির নীচে রান্না করতে বসতেন, রান্না হলে যেদিন সুযোগ ঘটত, সেদিন মা নিজ হাতে ঠাকুরকে স্নানের

জন্য তেল মাখিয়ে দিতেন। সাড়ে দশটা এগারোটার মধ্যে ঠাকুর আহার করতেন। তিনি স্নানে যেতেন, মা এসে তাড়াতাড়ি ঠাকুরের পান সেজে নজর রাখতেন ঠাকুর স্নান করে ফিরে এলেন কিনা। তিনি তাঁর ঘরে এলেই মা এসে জল ও আসন দিয়ে তারপরে খাবারের থালা নিয়ে এসে তাঁকে আহারে বসিয়ে নানা কথার মধ্য দিয়ে চেষ্টা করতেন, যাতে খাবার সময় ভাবসমাধি উপস্থিত হয়ে আহারে বিঘ্ন না ঘটায়। ঠাকুরের খাওয়া হলে মা একটু কিছু মুখে দিয়ে জল খেতেন। পরে পান সাজতে বসতেন। দেড়টা দুটোর আগে কোনো দিনই মায়ের খাওয়া হতো না। আহারের পরে নামমাত্র একটু বিশ্রাম করে সিঁড়িতে চুল শুকোতে বসতেন তিনটে নাগাদ। তারপর আলো-টালো ঠিক করে, তোলা জলে নমো নমো করে মুখ হাত ধুয়ে, কাপড় কেচে সন্ধ্যার জন্য প্রস্তুত হতেন। সন্ধ্যা হলে আলো দিয়ে ঠাকুরদেবতার সামনে ধুনো দেখিয়ে মা ধ্যানে বসতেন। এরপরে রাতের রান্না; সকলকে খাওয়ানো সেরে মা আহার করতেন। তারপর একটু বিশ্রাম করে শুয়ে পড়তেন। এ বর্ণনায় 'লোকায়ত বাঙ্গালি নারীর মূর্তিটি পরিস্ফুট' বলে মনে করেন সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

যোগীন মা বলেছিলেন ঠাকুরের খাওয়া হলে মা পান সাজতে বসতেন। 'পান সাজা হয়ে গেলে গুনগুন করে গান গাইতেন, তা খুব সাবধানে যেন 'কেউ না শুনতে পায়।' এক লজ্জাশীলা গ্রাম্যবধূ, যিনি ঘোমটার আড়ালে থাকতেন, তিনিই হলেন বঙ্গের মাতৃশক্তি মা সারদা দেবী। লোকসংগীতের প্রতি মায়ের আগ্রহ ছিল বরাবরই। যখন জয়রামবাটীতে থাকতেন। হরিদাস বৈরাগী মাঝে মাঝে এসে গান শুনিয়ে যেত।

— কী আনন্দের কথা উমে (গো মা)

(ওমা) লোকের মুখে শুনি, সত্য বল শিবানী,

অন্নপূর্ণা নাম কী তোর কাশীধামে?'

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বিয়ের পর মা সারদা যখন জোড়ে জয়রামবাটী আসেন, তখন ভানুপিসি বলেন, 'নাতনি তুই যেমন সুরূপা, তোর বর জুটেছে ন্যাংটা খ্যাপা।' এমনি করেই কৈলাশপতি শিব ও অন্নদা বাঙ্গালির লোকায়ত জীবনের সামগ্রী হয়ে উঠেছে। সাতবেড়ে গ্রামের লালু জেলে শ্রীমাকে পিসিমা বলতো। মাঝে মাঝেই সে এসে বাউল গান গাওয়ার বায়না করতো মায়ের কাছে। মা প্রথমটা রাজি হতেন না, কিন্তু সে জোর করেই একতারা নিয়ে গান ধরতো—

'সংসারকে সার ভাবে যে সেই তো মূঢ়।

(এই ভবের মাঝে) ভেবে দেখো কে কার বাবা, কে কার খুড়ো।।

এখন আলবোলাতে টানছো তামাক, শব্দ হচ্ছে গড়র গড়

যখন বৃদ্ধকালে দন্ত যাবে, খেতে হবে মুড়ির গুড়ো।।

শ্রীমাও কিন্তু সকলের সঙ্গে বসে এসব গান শুনতেন, হাসতেন,উপভোগ করতেন।

মা যশোদা ও বালক কৃষ্ণের বাৎসল্যলীলা ভারতবাসী তথা বাঙ্গালির প্রাণের সম্পদ। সন্তানের প্রতি মায়ের স্নেহস্নিগ্ধ আচরণ সর্বজনবিদিত। 'মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভরে'— মা সারদার মধ্যেও এই চিরন্তন মাতৃত্বের উজ্জ্বল প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। তিনি ব্রাহ্মণ থেকে চণ্ডাল— সকলের মা, হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান— সকলের মা। তিনি 'সতেরও মা। অসতেরও মা।' তাঁর আদরের খুকি (সিস্টার নিবেদিতা) তাই একটি চিঠিতে লেখেন 'আদরিণী মাগো, আজ সকালে খুব ভোরে গীর্জায় গিয়েছিলাম সারার (মিসেস ওলি বুলের) জন্য প্রার্থনা করতে। সেখানে সবাই মেরীর কথা ভাবছিল, হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল তোমার কথা। তোমার মিষ্টি মুখ, তোমার ভালোবাসা ভরা চোখ, তোমার সাদা শাড়ি, হাতের বালা; সবকিছু সামনে ভেসে উঠলো। সত্যই ভগবানের অপূর্ব রচনাগুলি সবই নীরব। তা অজানিতে আমাদের জীবনের মধ্যে প্রবেশ করে। —যেমন বাতাস, যেমন সূর্যের আলো, বাগানের মধু গন্ধ, গঙ্গার মাধুরী— এইসব নীরব জিনিসগুলি সব তোমারই মতো।'

সাধারণ বাঙ্গালি নারীর মতো মা সরল বিশ্বাসে মন্দিরে হত্যে দিয়েছেন। ওঝা ও জ্যোতিষীদের দেওয়া মাদুলি গ্রহণ করেছেন। দেব-দেবীর কাছে মানত করেছেন। রাধুর পাগলামো সারানোর জন্য 'ক্ষ্যাপাকালী'র বালা পরিয়েছেন। কোয়ালপাড়ার তান্ত্রিক সাধকের ওষুধ ব্যবহার করেছেন। চন্ড নামিয়ে তার উৎকট ওষুধ সংগ্রহ করে রাধুকে খাইয়েছেন। ঠাকুর যখন অসুস্থ হন, তখন শ্রীমা প্রচলিত লোকবিশ্বাস মেনে তারকেশ্বরে হত্যে দিতে গিয়েছিলেন। এ বিষয়ে মায়ের বক্তব্য ছিল 'অসুখ হলে ঠাকুরদের মানত করলে বিপদ কেটে যায়। আর যার যা প্রাপ্য তাকে তা দিতে হয়।' শ্রীমা গ্রামবাঙ্গলার লোকবিশ্বাসগুলি মেনে চলতেন। বারবেলায় বিশ্বাস ছিল মায়ের। সকাল সকাল বেরোতেন জয়রামবাটী থেকে কলকাতায় আসার সময়। লোকায়ত সমাজের কুপ্রথাকে মায়ের যুক্তিবাদী মন কীভাবে মেনে নিল। এ প্রশ্ন উঠতেই পারে। মনে হয়, একটি সমাজের আচার-বিচার, রীতি-নীতি সমাজের নিয়মে পরিণত হয়। কোনো যুক্তি নয়, দীর্ঘদিন চলে আসা প্রথাকে শ্রীশ্রী মা তাঁর জীবনাচরণ দিয়ে সে শিক্ষাই দিয়ে গেছেন। এজন্যই আশাপূর্ণা দেবী বলেছেন, 'তাঁর জীবনই তাঁর বাণী।'

তাঁর বাণীগুলিও যেন লোকশিক্ষার বাহন। সহজ, সরল অথচ গভীর, বাস্তব। একবার গিরিশ ঘোষের সঙ্গে জয়রামবাটীতে কালীমামার তুমুল ঝগড়া। গিরিশবাবু বলেন মা দেবী। সে কথা কালীমামাকে বিদ্ধ করে। তিনি ছেলেবেলা থেকেই তাঁকে দিদি বলে জানেন। কিন্তু তর্কে জয়লাভ করেন গিরিশ ঘোষ। পরাস্ত হয়ে ভীত কালীমামা মায়ের শরণ নিতে এলেন। মা বললেন, ওরে কালী আমি তোর সেই দিদি। আর তুই একী করছিস? হাফ্ ছেড়ে বাঁচলেন কালীমামা। লোকশিক্ষা প্রদানের জন্যই মা সারদা দুই

সত্তায় প্রকাশিত হয়েছেন। কখনো তিনি মানবী, কারও মা, কারও দিদি, কারও খুড়ি, কারও পিসি, আবার গুরু শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেবের কাছে, ভক্তদের কাছে তিনি দেবী। দুটি বিপরীতমুখী সত্তাকে দৃঢ় ও শান্তভাবে তিনি নিয়ন্ত্রণ করেছেন।

শ্রীমার সমসাময়িক সমাজ হলো শতবর্ষের বেশি আগের বঙ্গের লোকায়ত সমাজ। বহু শিক্ষিত বাঙ্গালিও এসময় জাতপাত ও কুপ্রথার আবদ্ধ ছিল। এই সময় মা সারদা ছিলেন বাঙ্গালির মাতৃত্বের এক চিরন্তন ভাবমূর্তি। আশাপূর্ণা দেবীর ভাষায় 'মা-সারদা বহুবিধ মতানৈক্যের সমাধানে একটি ঐক্যের রূপ।' মাতৃত্বের চেতনা এক বিশ্বজনীন সংস্কারমুক্ত চেতনার প্রতিচ্ছবি। তাই বিদেশিনী মার্গারেট ছিলেন মায়ের আদরের খুকি। তাকে কাছে বসিয়ে নিজের হাতে খাইয়েছেন, একসঙ্গে খেয়েওছেন। অনেকসময় বহিরাগত কোনো ভক্তের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে মায়ের ভক্তরা মাকে তার থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। মা বলেছেন, 'তেমনকথা আমার মুখ দিয়ে বেরোবে না। ...আমার ছেলে যদি ধুলোকাদা মাখে, আমাকেই ধুলো ঝেড়ে কোলে নিতে হবে।' মুসলমান ভক্ত ঠাকুরের জন্য কলা এনে, দ্বিধাভরে জিজ্ঞাসা করেছে, মা নেবেন কিনা। মা বলেছেন, 'খুব নেব বাবা, দাও, ঠাকুরের জন্য এনেছ নেব বই কী।' অনেক ভক্ত মাকে সচেতন করে বলেছেন, ওরা চোর, মন্দলোক। মা বলেছেন, 'কে ভালো, কে মন্দ আমি জানি। দোষ তো মানুষের লেগেই আছে। কী করে তাকে ভালো করতে হবে, তা জানে কজনে?' কী করে মন্দকে ভালো করতে হবে, তা জানা ছিল মায়ের। কত চোর, পাপী ভক্তকে ক্ষমা দিয়ে ভালো করেছেন মা।

মায়ের জীবনাচরণে তাঁর কথার মধ্যেই জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এক গভীর সমন্বয়ের শিক্ষা রয়েছে। বিশ্বাস ও ক্ষমার মধ্য দিয়ে অসততা ও পাপের বিনাশ— এ যেন এক নীরব অথচ শক্তিশালী যুদ্ধ। যাত্রাপথে একবার এক ডাকাত দম্পতির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় মায়ের। মায়ের আন্তরিক আচরণ ডাকাত দম্পতিকেও বদলে দেয়। মা অকপটে বলেন, 'আমার শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) যেমন ছেলে, এই আমজাদও তেমন ছেলে।' কোথায় শরৎ মহারাজ আর কোথায় ডাকাত আমজাদ, শরৎ মহারাজ যে মায়ের একান্ত নির্ভরস্থল। বিশ্বাসের বাঁধন এমনই শক্ত যে একবার মায়ের মনেও হলো না শরৎ একথা শুনলে কিছু মনে করতে পারে। ভক্তরা খেয়ে গেলে মা এঁটো কুড়িয়ে নিতেন, অনেক সময় এরকম প্রশ্ন আসতো 'মাগো, ছত্রিশ জাতের এঁটো কুড়োচ্ছো?' উত্তরে মা বলতেন, 'ছত্রিশ' কোথায়? সব যে আমার।' এই ভক্তেরা তাঁর কাছে একটি জাতের ছিল, সে হলো ভক্তের জাত, তাঁর সন্তান। ইংরেজদের প্রতি কেউ ক্রুদ্ধ হলে বলতেন, 'তারাও তো আমার ছেলে।' ভক্ত সন্ন্যাসীদের অনেক মান-অভিমানের ধাক্কা মাকে সামলাতে হতো। মা বলতেন, 'জ্ঞানী সন্ন্যাসী যেন হাতির দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো। কিন্তু সন্ন্যাসীর রাগ অভিমান? সে যেন বেতের রেক, চামড়া দিয়ে বাঁধা।'

উঠোন পরিষ্কারের সময় কেউ ঝাঁটা ছুঁড়ে ফেললে বলতেন, 'ও কী গো! যার যা মান্যি, তাকে সেটি দিতে হয়, ঝাঁটাটিকেও মান্যি করে রাখতে হয়।' কখনো বলতেন, 'সময়ে ছাগলের পায়েও ফুল দিতে হয়। ভক্তদের বলতেন— 'স্ত্রীলোকের লজ্জাই হলো ভূষণ।' যার আছে ভয়, তারই হয় জয়, যে সয়, সেই রয়।' মা নিজেও ছিলেন সহনশীলা। ভক্তদের বলতেন, 'পৃথিবীর মতো সহ্যগুণ চাই, সন্তোষের সমান ধন নেই, সহ্যের সমান গুণ নেই।' যারা ভালোবাসা, শান্তির খোঁজে বেরিয়েছে, তাদের জন্য মা বলেছেন, 'যাকে ভালোবাসবে তার কাছে প্রতিদান কিছু চাইবে না, তবেই সকলের উপর সমান ভালোবাসা হয়।' 'যদি শান্তি চাও মা, কারো দোষ দেখো না, দোষ দেখবে নিজের।' তাঁকে ভগবান লাভের কথা বললে তিনি বলতেন, 'ভগবান লাভ হলে কী আর হয়? দুটো কী শিং বেরোয়? না, মন শুদ্ধ হয়, শুদ্ধ মনে জ্ঞান-চৈতন্য লাভ হয়।' এমনই নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে কখনো ভক্তদের কাছে, কখনো আত্মীয়দের কাছে মা সারদা এমন বহু কথা বলেছেন, যেগুলি একটি মানুষের সৎ ও সুন্দর জীবনযাপনের জন্য পথপ্রদর্শক হয়ে উঠতে পারে।

মানবচেতনার এক সন্ধিক্ষণে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমার পুণ্য আবির্ভাব। বঙ্গের ক্ষুদ্র দুটি গ্রাম— কামারপুকুর-জয়রামবাটী থেকে যে চেতনার বিচ্ছুরণ সমগ্র পৃথিবীবাসীকে প্লাবিত করেছিল, তা আজকের অতৃপ্ত, অবক্ষয়িত ক্লান্ত মানুষকেও একইভাবে পুণ্যসলিলে স্নাত করে চলেছে। এই পবিত্র চেতনার প্রবাহ সদর্থক, সরল, বাস্তব অথচ সৎ, সত্য ও সুন্দর। অবতারগণ পৃথিবীতে আসেন শুধু গড়তে, তাই আজকের ভাঙনের কালে শ্রীরামকৃষ্ণের আনন্দ ও স্নেহধারার প্রতিমূর্তি মা সারদার জীবনচর্যা ও মানসচর্চা লোকায়ত বিশ্বকে দেবে স্থিতিশীলতা, শান্তি।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য— শ্রীশ্রী সারদা দেবী— ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ, ১৩৮৮। ২. মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত— শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবী— কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬৩। ৩. স্বামী ঈশানানন্দ--- মাতৃসান্নিধ্যে— উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৮১। ৪. স্বামী গম্ভীরানন্দ— শ্রীমা সারদাদেবী— উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৩৮৪। ৫. স্বামী নিরাময়ানন্দ— শ্রীশ্রীমা সারদা— শ্রীশ্রী মাতৃমন্দির, জয়রামবাটী, সপ্তম সংস্করণ, ১৩৮৩। ৬. স্বামী পরমেশানন্দ— শ্রীশ্রীমা ও জয়রামবাটী— শ্রীশ্রী মাতৃমন্দির, বাঁকুড়া, প্রথম সংস্করণ, ১৩৭৯। ৭. স্বামী শ্রদ্ধানন্দ— অতীতের স্মৃতি— উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৮৯। ৮. স্বামী সারদেশানন্দ--- শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা--- উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৮৯।

পত্রিকা

উদ্বোধন— শ্রী শ্রীমা— শতবর্ষ-জয়ন্তী-সংখ্যা (বৈশাখ ১৩৬১)

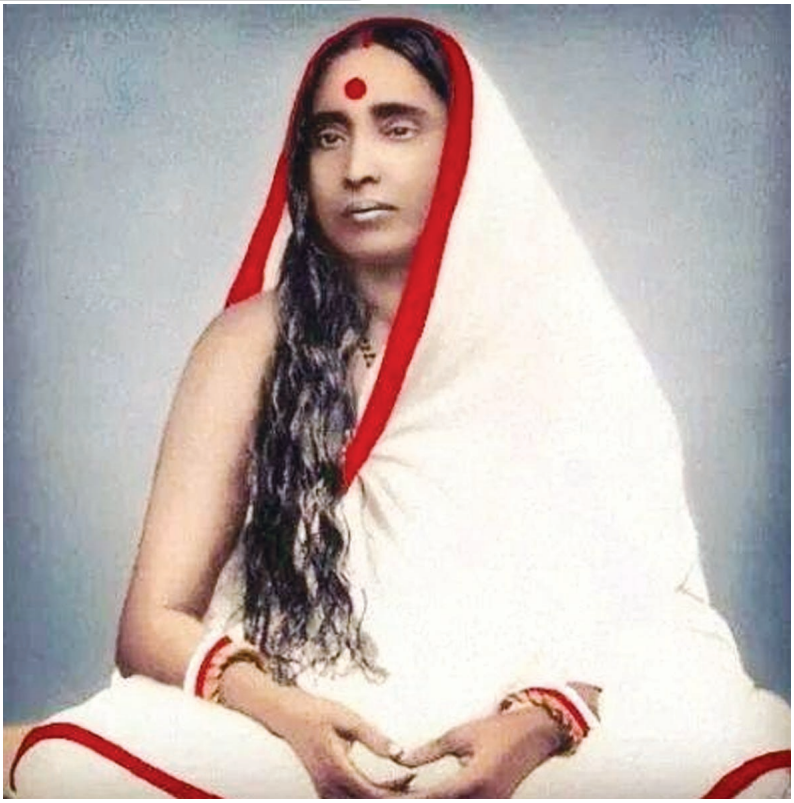

শ্রীশ্রীমায়ের তীর্থযাত্রা

সাধ্বী সুমিত্রাম্বা (মিতা মা)

সবেমাত্র রক্তমাংসের খোলটি ছেড়ে স্বধামে গমন করেছেন ঠাকুর। যে সংকল্প নিয়ে পুণ্যভূমি কামারপুকুর ছেড়ে একদিন পাশ্চাত্য ভাবোন্মুখী পোকার মতো কিলবিল করা মানুষগুলোর চৈতন্য ফেরাতে তিনি হাজির হয়েছিলেন কলকাতায়। সেই অসমাপ্ত কর্মযজ্ঞের দায়িত্বে রেখে গেলেন তাঁরই কল্পকায়া চৈতন্যদায়িনী দেবী সারদাকে। দেহে থাকতেই নিজেকে দেখিয়ে সারদা দেবীকে বলেছিলেন— এ আর কী করেছে, তোমাকে এর চাইতে ঢের বেশি করতে হবে। সেদিন নীরবে শুনেছিলেন মা। ঠাকুরের ওই উক্তির মর্মার্থ কতটা বুঝেছিলেন তা তিনিই জানেন। তাঁর অতিসাধারণ সহজ সরল ব্যবহারের নিরিখে তাঁর বোধশক্তির গভীরতা অনুধাবন করা বোধহয় শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া আর করার পক্ষেই সম্ভব ছিল না।

কাশীপুরের উদ্যানবাটির আনন্দের হাট ভেঙ্গে গেল। ভক্তদের মিলন ক্ষেত্র হারিয়ে গেল। কে যে কোথায় যাবে 'ভারাক্রান্ত মনে তারই ভাবনায় ডুবে গেল। মা-ও তৈরি হলেন বাগান বাড়ি ছেড়ে যাবার জন্যে। ঠাকুরের নির্দেশের কথা মনে পড়ল— কামারপুকুরে থাকবে। শাক বুনবে খাবে, কারও কাছে চিৎহাত করবে না। ঠাকুরের এই নির্দেশিকা মেনে নিয়েই কামারপুকুরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত পাকা করলেন মা। শেষ পর্যন্ত কামারপুকুর আর যাওয়া হলো না। এগিয়ে এলেন ঠাকুরের অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভক্ত বলরামবাবু। সাদরে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন মাকে। মায়ের শোকের গভীরতা বুঝতে পেরেই সাময়িকভাবে নিজের বাড়ি নিয়ে গিয়ে মায়ের তীর্থদর্শনের ব্যবস্থায় তৎপর হলেন, যাতে শোকের কিছুটাও উপশম হয়।

বৃন্দাবন দর্শনে যাত্রা করলেন মা। সঙ্গী গোলাপ মা, লক্ষ্মীমণি, মাস্টারমশায়ের স্ত্রী, যোগেন মহারাজ, কালী মহারাজ আর মায়ের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী লাটু মহারাজ।

সর্বপ্রথম হাজির হলেন দেওঘরে। সেখানে বৈদ্যনাথধাম দর্শন করে রওনা হলেন কাশীধামের উদ্দেশে। বিশ্বনাথ মন্দির দর্শন করলেন। বিশ্বনাথ দর্শনে ভাবাবেশ হলো মায়ের। মহানন্দে তীর্থভূমির রসাস্বাদন করলেন সকলে। অন্নপূর্ণার মন্দির এবং অসংখ্য দেব-দেবী দর্শন করে এবারে এগিয়ে চললেন অযোধ্যার উদ্দেশে। শ্রীরামচন্দ্রের দিব্য জন্মভূমি দর্শনে যারপরনাই আনন্দ পেলেন মা। এবার চলেছেন শ্রীবৃন্দাবনে। রাসবিহারী রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমির মাধুর্য আস্বাদনের আশায় ব্যাকুল তিনি। রেলগাড়িতে চলেছেন। ঠাকুরের ইষ্টকবচ সদাই থাকতো মায়ের হাতে। জানালার পাশেই সেই হাতটা রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে ছিলেন মা। রাতের অন্ধকার ভেদ করে ছুটে চলেছে ট্রেন। হঠাৎই জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ঠাকুর বললেন, কবচটি সঙ্গে রয়েছে, দেখো যেন না হারায়। হুঁশ হলো মায়ের। তাড়াতাড়ি হাতের কবচটি খুলে ঠাকুরের নিত্যপূজার ছবিটি যে বাক্সে ছিল সেইখানেই রেখে দিলেন মা। তারপর থেকে কবচটি সেই বাক্সেই রাখতেন।

বৃন্দাবনে পদার্পণ করলেন মা। বলরামবাবুদের ঠাকুরবাড়ি কালবাবুর কুঞ্জ, সেখানেই উঠলেন তাঁরা। সেখানেই দেখা হলো যোগেনমায়ের সঙ্গে। দক্ষিণেশ্বর থেকে বিদায় নিয়ে তিনি বৃন্দাবনেই এসেছেন। আর উঠেছিলেন সেই কালবাবুর কুঞ্জে। বিগত দিনের সুখস্মৃতি অন্তরে উদয় হলো যোগেনমায়ের। কাঁদছেন তিনি— মাও কাঁদছেন। দক্ষিণেশ্বরের নরদেবতার কথা স্মরণ করে সকলেই বিহ্বল হলেন। ক্রমশ আত্মমগ্ন হলেন মা। বৃন্দাবনের মধুর ভাবে সকলেই যখন নিমগ্ন সেই সময় ম্যালেরিয়ায় পড়লেন মাস্টারমহাশয়ের স্ত্রী। তাঁকে নিয়ে কলকাতায় ফিরলেন কালী মহারাজ। মাস ছয়েক পরে রামবাবুর বাড়ি থেকে দুঃসংবাদ পেয়ে লাটু মহারাজও ফিরলেন কলকাতায়। বাকি সঙ্গীসাথী-সহ মা রয়ে গেলেন বৃন্দাবনে। মন্দিরে মন্দিরে দর্শন, কোথাও জপেতপে তন্ময় হয়ে যাওয়া,আবার কখনও একাই যমুনার নির্জন পুলিনে তন্ময় হয়ে বসে থাকা।

রামকৃষ্ণকে হৃদয় বৃন্দাবনে ধারণ করে মা যেন হয়ে উঠেছেন জীবন্ত রাধিকা। সমাধিস্থ মায়ের হুঁশ থাকে না, অনেক চেষ্টায় সমাধিভঙ্গে ঠাকুরের মতনই বলে ওঠেন— জল খাব। এক অনাবিল শান্তির ভাব মা অনুভব করেছিলেন বৃন্দাবনে।

পরিক্রমার পথে চলেছেন মা--- গিরিগোবর্দ্ধন, শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, রাধারানির জন্মস্থান বর্ষানা— সদলবলে যোগেন-মা। রয়েছেন ভাবসুখে। এই বৃন্দাবন হয়তো তাঁর বহু আগের চেনা— সেই চেনা চিহ্নগুলো কৌতূহলী দৃষ্টিতে মিলিয়ে নিচ্ছেন ভাবমণ্ডিত বৃন্দাবনের পবিত্র রসে। মা-কে এক নতুন কর্মে ব্রতী করলেন ঠাকুর। যোগেন-মাকে দীক্ষাব্রতে ব্রতী করার নির্দেশ দিলেন। বার বার তিনবার এলো এই নির্দেশ। সে নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না মা। বৃন্দাবনে ভাবমণ্ডিত ক্ষেত্রেই শুরু হলো মায়ের জীবনের নবতম অধ্যায়। গুরু মূর্তিতে মায়ের প্রকাশ।

এবারে যাত্রাপথ এসে থামলো দেবভূমি হিমালয়ের পাদদেশ হরিদ্বারে। রামকৃষ্ণের কেশ, নখ সঙ্গে এনেছিলেন মা। হরিদ্বারের গঙ্গার ব্রহ্মকুণ্ডে সেসব বিসর্জন দিলেন। তারপর জয়পুর এসে দর্শন করলেন গোবিন্দজীকে। স্নান করলেন পুষ্করতীর্থে। ব্রহ্মামন্দির দর্শনান্তে বালিয়াড়ি পার হয়ে সাবিত্রী পাহাড়ের শীর্ষদেশে সাবিত্রীমন্দিরে পূজা করলেন।

এবার ফেরার পালা। ফিরতিপথে পুণ্য প্রয়াগে ঠাকুরের কেশরাশি বিসর্জন দিলেন। বৎসরান্তে তীর্থপরিক্রমা করে আনন্দিত চিত্তে মা কলকাতায় ফিরলেন।

স্বামীর নির্দেশক্রমে রওনা হলেন কামারপুকুরের পথে। শুরু হলো কামারপুকুরে মায়ের নিঃসঙ্গ জীবন। নিঃসম্বল জীবন তবুও ভেঙ্গে পড়লেন না মা। ওই কঠিন পরিস্থিতিতেও নিরুত্তাপ-নিরুদ্বিগ্ন মা। যেখানে সংসারী মানুষের চেহারাটা অন্য। তারা সুখের প্রাপ্তি আর দুঃখের নিবৃত্তির জন্যে সদাই সচেষ্ট। বিপরীত পরিস্থিতি, দুঃখ নিবৃত্তির জন্যে সদাই সচেষ্ট। বিপরীত পরিস্থিতিতে দুঃখ বা অভাব এলে তা মানিয়ে নিতে পারে না। কারণ নিতান্ত সংসারী মানুষের যেটা অভাব তা মানিয়ে নেওয়ার শক্তি। কিন্তু মা ছিলেন তিতিক্ষার মূর্তি। একটা ঘটনা উল্লেখ করলে বিষয়টা স্পষ্ট হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবসানের পর মা-কে চূড়ান্ত আর্থিক অনটনে পড়তে হয়। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির পক্ষ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁর জীবদ্দশায় মাসিক সাতটাকা মাসহারা দেওয়া হতো। তাঁর দেহাবসানের পর মাত্র কয়েকমাস মা সারদাকে ওই টাকা দেওয়া হয়। পরে ঠাকুরের কোনো এক নিকট আত্মিয়ের প্ররোচনায় মন্দিরের কর্তৃপক্ষ তা বন্ধ করে। সেই চূড়ান্ত অর্থকষ্টও বিন্দুমাত্র টলাতে পারেনি মা-কে। শান্ত-অবিচল মা সারদা নিরুদ্বিগ্ন স্বরে শুধু বলেছিলেন— এমন ঠাকুরই চলে গেলেন, টাকা নিয়ে আর আমি কী করব।

বিবেক চূড়ামণিতে অসাধারণ একটি শ্লোকের অবতারণা করেছেন আদিগুরু শঙ্করাচার্য—

সহনং সর্বদুঃখানাম্ অপ্রতীকার পূর্বকম্।
চিন্তা বিলাপ রহিতং সা তিতিক্ষা নিগদ্যতে।।

কোনো উদ্বেগ ছাড়াই, বিলাপ বা ক্রন্দন রহিত হয়ে কোনোরকম প্রতিকারের ইচ্ছা ব্যতীত সব দুঃখ সহ্য করাটাই হলো তিতিক্ষা।

সেই তিতিক্ষারই প্রতিমুর্তি হলেন মা সারদা। শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পতিপরায়ণা জগৎ মাতৃত্বের অবিকল মূর্তির সাক্ষাৎস্বরূপ। পরনের কাপড় ছেঁড়া, তাতেই গিঁট বেঁধেছেন। নিজে হাতে কোদাল কুপিয়ে শাক বুনেছেন। আনন্দ করে সেই শাক দিয়ে ভাত খেয়েছেন। দেবীত্বের পরাকাষ্ঠায় সমুজ্জ্বল মূর্তি।

মায়ের আধ্যাত্মিক জীবনের এক নতুন মাত্রা যোগ হলো কামারপুকুরে এসে। কিন্তু শুধুমাত্র খুঁটে খেয়ে বেঁচে থাকার জন্যে তিনি জগতে আসেননি। ঠাকুরের অনেক কাজ বাকি। দুঃখ-কষ্টের আগুনে পুড়িয়ে শুচিস্নিগ্ধ করে নিলেন ঠাকুর। কারণ মায়ের যে অনেক কাজ। এবারে শ্রীক্ষেত্রের উদ্দেশে রওনা হলেন মা। পুরী যাওয়া তখন সোজা ছিল না। কলকাতা থেকে জাহাজে ওড়িশার চাঁদবালি বন্দর। সেখান থেকে জলপথে কটক। কটক থেকে গোরুর গাড়িতে প্রায় ষাট মাইল পথ চলে যেতে হতো পুরী।

শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করেছেন মা। মায়ের চোখ বন্ধ, যোগেন-মা ঠেলা দেন— তোমার চোখের সামনে জগন্নাথ, চোখ বুঁজে আছো কেন? আঁচলের নীচে থেকে মা বের করেছেন ঠাকুরের ফোটো, মা তাঁকে প্রথম দর্শন করিয়ে এবারে নিজের চোখ খুললেন। শরীরে থাকাতে ঠাকুর পুরীধামে আসতে চাননি। তাই দর্শনও হয়নি ঠাকুরের। রত্নবেদীর পুরুষসিংহ জগন্নাথের মধ্যেই মা দর্শন করলেন দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণকে।

কলকাতায় ফিরে কালীঘাটে গিয়ে মা কালীকে দর্শন করলেন। তারপর গেলেন স্বামী প্রেমানন্দের জন্মভিটা আঁটপুরে। সেখান থেকে তারকেশ্বর হয়ে আবার কামারপুকুর। কামারপুকুরে বেশ কিছুদিন থাকার পর কলকাতায় ফিরে স্বামী অদ্বৈতানন্দজীর সঙ্গে গেলেন গয়া। চন্দ্রামণি দেবী গত হবার পর ঠাকুর মা-কে বলেছিলেন গয়ার বিষ্ণু পাদপদ্মে মায়ের উদ্দেশে পিণ্ডদান করতে। সুযোগ পেয়ে মা গয়ায় এসে সেই কাজ সমাধা করলেন। সেখান থেকে গেলেন বুদ্ধগয়া। ফল্গু নদীর তীরে সুরম্য স্থান, মঠ মন্দির, সন্ন্যাসীদের থাকার সুব্যবস্থা দেখে মায়ের মনে পড়ে ঠাকুরের ত্যাগী শিষ্যদের কথা। ঠাকুরের কাছে কাতর প্রার্থনা জানান ওই ত্যাগী সন্তানদের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের জন্যে, যাতে শান্তিতে তারা ঠাকুরের প্রচার করতে পারে। আর এগোতে পারে অধ্যাত্ম সাধনায়, জীব কল্যাণের ব্রতে। গয়া, বুদ্ধগয়া দর্শন করে এবারে মা এলেন ভগবান বৈদ্যনাথ শিবের দর্শনের উদ্দেশে দেওঘরে। বলরামবাবুর মেয়ে ভুবনমোহিনীর মৃত্যুতে তার মা কৃষ্ণভাবিনী শোকে অধীর হয়ে ওঠেন। শোকসন্তপ্তা মা-কে শান্ত করতে বিহারের অন্তর্গত কৈলোয়ারে কৃষ্ণভাবিনীকে পাঠাবার সিদ্ধান্ত হলে কৃষ্ণভাবিনীর ইচ্ছায় অবলীলায় দেবী সারদা তার সঙ্গী হলেন। প্রায় দু-মাসকাল মায়ের মধুর সান্নিধ্যে থেকে শান্তির স্পর্শ পেলেন কৃষ্ণভাবিনী দেবী।

আবারও রওনা হলেন মা বৃন্দাবনের উদ্দেশে। এবারে সঙ্গী হলেন শ্যামাসুন্দরীদেবী আর তাঁর পুত্রেরা। উঠলেন সেই কালাবাবুর কুঞ্জেই। বৃন্দাবনে মা একটি পিতলের গোপাল মূর্তি কিনেছিলেন। সেটি অপূজিত অবস্থাতেই রাখা হয়েছিল। সেই ছোট্ট গোপাল একদিন হামাগুড়ি দিয়ে মায়ের কাছে এসে তাঁকে বলে— তুমি আমায় এনে ফেলে রেখেছো, খেতে দাও না, পূজাও করো না, তুমি আমায় পূজা না করলে সে কেউই আমাকে পূজা করবে না। সেই থেকে মা গোপালের পূজার ব্যবস্থা

করলেন। নিত্যপূজিত রামকৃষ্ণের ছবির পাশে রেখে দিলেন। আজও মায়ের মন্দিরে সেই গোপাল মূর্তি পূজিত হচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর থেকেই সংসারের কিছুই ভালো লাগছিল না মায়ের। আবার বেলুড় মঠও প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের পূত দেহাবশেষ স্থাপিত হয়েছে মঠের বেদীতে। সন্ন্যাসীদের মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে, আর তাঁর থাকা কেন? ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেন মা— আর আমার এ সংসারে থেকে কী হবে? মায়ের অন্তর জুড়ে শুধুই তখন সংসার ত্যাগ করে স্বধামে প্রত্যাবর্তনের বাসনা। এমতাবস্থায় একদিন লাল শাড়িপরা দশ-বারো বছরের একটি মেয়েকে দেখিয়ে ঠাকুর মা-কে বলেন, একে আশ্রয় করে থাকো। তোমার কাছে কত ছেলেরা এখনও আসবে।

সদ্য প্রয়াত ভ্রাতা অভয়চরণের কন্যাকে ইঙ্গিত করেই বোধহয় এভাবে মাকে দর্শন করিয়েছিলেন ঠাকুর। ভ্রাতৃজায়া সুরবালার যোগ্য স্বামী চলে গেলে শোকে মাথা খারাপ হয়ে গেল তার। সেই অবস্থায় কন্যা রাধারানিকে মানুষ করে কে?

ঠাকুরের ইঙ্গিত বুঝতে দেরি হলো না মায়ের। ভাবলেন— আমি একে না দেখলে আর কে দেখবে? ছুটে গিয়ে রাধুকে তুলে নিলেন মা। সেই রাতেই ঠাকুর দর্শন দিয়ে বললেন— এটি যোগমায়া। একে আশ্রয় করে সংসারে থাক।

শোকসন্তপ্তা সুরবালা-রাধারানি-সহ মা পুরীতে জগন্নাথ দর্শনে রওনা হলেন, পুরীতে জগন্নাথ দেখবেন কী, মা রাধুকে সামলাতেই ব্যস্ত। রাধুও মাকে একাই দখল করে থাকতে চায়। তাই মায়ের ইচ্ছায় জয়রামবাটী থেকে যখন শ্যামাসুন্দরী-সহ, অন্যান্যরা এলেন, তখন সেই দলবল দেখে হাতমুখ নেড়ে ছড়া কেটে মাকে দু'চার কথা শোনাতে ছাড়লেন না রাধু। ততদিনে যোগমায়ার বিচিত্র লীলা শুরু হয়ে গেছে মায়ের জীবনে— রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাণবিন্দু বিবেকানন্দের তিরোধান। ওদিকে আবার প্রসন্নের স্ত্রী কলেরায় মারা গেলে তার দুই মেয়েরও দেখার ভার পড়লো মায়ের ওপরে। সংসারের মায়ার বাঁধনে বেঁধে মাকে যেন নিরন্তর পরীক্ষা করতে চাইছেন ঠাকুর। শোক আর দুঃখের ভার বাড়িয়ে দেখছেন জয়রামবাটীর রাম মুখুজ্যের মেয়ে সারু তাঁর সহধর্মিণী হয়ে কেমন ভাবে শোক আর দুঃখ্যের ভার সামলে যথার্থ জগজ্জননী হয়ে উঠতে পারেন। এর মধ্যেই চলেছে নবাগত মুমুক্ষু সন্তাদের দীক্ষা।

বলরামবাবুর যোগ্য সন্তান রামকৃষ্ণ বসুর ইচ্ছা যে, মা-কে তার কোঠারের জমিদারিতে নিয়ে যাবেন। ভদ্রক থেকে যেতে হয় কোঠার। সদলবলে মা হাজির হলেন কোঠারে। মায়ের পদস্পর্শে ছোট্ট গ্রামখানি যেন জেগে উঠলো। দূরদূরান্ত থেকে আসে ভক্তের দল। ঘটা করে সরস্বতী পূজা করা হলো। গ্রামের পোস্টমাস্টার ঘটনাচক্রে খ্রিস্টান হয়েছিল। তিনি স্বধর্মে ফিরতে চাইলেন। তার প্রার্থনায় বিধান দিলেন মা— রামকৃষ্ণবাবুদের গৃহদেবতা রাধাশ্যাম মন্দিরে যথারীতি প্রায়শ্চিত্ত করে যজ্ঞোপবীত ধারণ করলেই হবে। সেই ব্যবস্থা মতো কাজ হলে সরস্বতী পূজার দিনই মা তাকে দীক্ষা দিলেন। রামকৃষ্ণবাবুও দীক্ষা নিলেন।

কোঠার থেকেই দক্ষিণ ভারতের রামেশ্বর তীর্থে যাবার কথা হলো। মাদ্রাজ মিশনের স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে জানানো হলো। তিনি পরম আগ্রহে মায়ের দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের সব ব্যবস্থা করেন। কৃষ্ণলাল মহারাজ, শুকুল মহারাজ, গোলাপ মা, আরও অনেকে সঙ্গী হলেন। চলেছে মাদ্রাজ মেল। গঞ্জাম স্টেশনে কেলনার কোম্পানির বাঙ্গালি ম্যানেজার মাকে তাঁর বাড়ি নিয়ে গেলেন। বহু ওড়িয়া, তেলুগু নর-নারী মায়ের শ্রীচরণ পূজা করলেন। বিশ্বমাতৃত্বের প্রতিমূর্তিতে মা প্রতিষ্ঠাতা হতে চলেছেন। পরদিন আবার যাত্রা শুরু। ওয়ালটেয়ার হয়ে মাদ্রাজ পৌঁছলেন মা। মহাসমারোহে অভ্যর্থনা করে ময়লাপুর অঞ্চলের একটি বাড়িতে তুললেন রামকৃষ্ণানন্দ। মা এখানে প্রায় একমাস ছিলেন। এর মধ্যেই মাদ্রাজ শহরের দর্শনীয় স্থানগুলো দেখে নিলেন মা। মাদ্রাজ থেকে মাদুরাই। বিখ্যাত মীনাক্ষী মন্দির দর্শন করেন মা।

মাদুরাই থেকে চললেন রামেশ্বর। রামেশ্বরম্ তখন রামনাদের রাজার অধীনে। রামনাদের রাজা ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য। তাই মায়ের আসার আগেই রামনাদের রাজা মন্দিরের কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন— আমার গুরুর গুরু পরমগুরু যাচ্ছেন। সব ব্যবস্থা করবে। রামেশ্বর মন্দিরের এলাকা সুবিশাল। মন্দিরে বালুকাময় শিবলিঙ্গ। মূর্তি সোনার আবরণে সদাই ঢাকা থাকে। ভোরে একবার এই আবরণ উন্মোচন করা হয়— তখন দর্শন মেলে। মা মন্দিরে ঢুকেছেন, শিবলিঙ্গ দর্শন করে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন মূর্তির দিকে। মা তদ্‌গত ভাবে বলে ওঠেন— 'যেমনটি রেখে গেছিলাম ঠিক তেমনটিই আছে।' কাছের জন শুধোয়— মা, ওকি বললে।'

নিজেকে সামলে নিয়ে মা বলেন, ও একটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। আত্মস্বরূপ কোনোদিনই প্রকাশ করেননি মা। তিনিই যে জন্মান্তরে স্বয়ং সীতারূপে অবতীর্ণা হয়ে বালুকাময় এই শিবলিঙ্গকে পূজা করেছিলেন সেই গুঢ় কথাটি কোনোভাবেই প্রকাশ করতে চাননি। পুরোহিত ছাড়া অন্যদের গর্ভমন্দিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ হলেও শ্রীমা ও তাঁর সঙ্গিরা মহাসমাদরে গর্ভমন্দিরে নীত হয়েছিলেন এবং লিঙ্গের মুকুটাবরণ উন্মোচন করে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সংগৃহীত একশো আটটি সোনার বেলপাতা ও গঙ্গোত্রীর জলে অনাচ্ছাদিত রামেশ্বরের পূজা করেছিলেন। কেদারবাবুর জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীমা আর আত্মস্বরূপ গোপন করেননি— সুস্পষ্টভাবেই প্রকাশ করে দিয়েছিলেন যে, তিনি সীতা। এমনই দু-একটি বিশেষ ক্ষেত্রে ভাবঘোরে তাঁর অজ্ঞাতসারেই সামান্য উন্মুক্ত হয়েছিল তাঁর প্রকৃত স্বরূপ।

আসলে সারদাদেবী শুধুমাত্র রামকৃষ্ণ ভাবাশ্রয়ীদের জননী নন, তিনি জননী, রামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলের বাইরে সারা বিশ্বের মানুষের জননী। শুধু তাই বলি কেন, স্থাবর জঙ্গম কীটপতঙ্গ, পশুপক্ষী— স্বদেশী, বিদেশি নির্বিশেষে তিনি বিশ্বমাতৃত্বের সুধাকুম্ভ স্বরূপা। তাঁর তীর্থ দর্শনের পথে যত্রতত্র মানুষের সংযুক্তীকরণ ঘটেছে, তাঁর অপরা করুণা ধারায় তারা সকলেই কৃতকৃত্য হয়েছে। পরমেশ্বরী জগজ্জননীর কৃপায় তাদের পাশমুক্তি ঘটে অমৃতলোকে উপনীত হয়েছে তারা। তাঁর মহিমান্বিত পাদস্পর্শে জাগ্রত হয়েছে তীর্থভূমি। আজ এই আধুনিককালেও তাই মা সারদা ততটাই প্রাসঙ্গিক যতটা ছিলেন সেদিন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষদের কলকাতায়। □

ঢাকায় দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে কড়া বার্তা ভারতের বিদেশ সচিবের

নিজস্ব প্রতিনিধি।। বাংলাদেশের অন্তবর্তীকালীন সরকারের সচিব পর্যায়ের বৈঠকের পর সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহম্মদ ইউনুসের সঙ্গে সৌজন্য বৈঠক করেন ভারতের বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি। গত ৯ ডিসেম্বর ঢাকার অতিথি ভবন পদ্মায় ঘণ্টাখানেক বৈঠকে বাংলাদেশের অশান্ত পরিস্থিতি নিয়ে ভারতের পক্ষ থেকে কড়া বার্তা দেওয়া হয়।

দীর্ঘ সময় ধরে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার, হত্যা, অগ্নিসংযোগ, নারী নির্যাতন, লুটপাটের ফলে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কে অবনতি ঘটেছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ারও কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বাংলাদেশে বসবাসকারী হিন্দুরা দীর্ঘদিন ধরে ভারত তথা আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়ে এসেছে, সেক্ষেত্রে এই বৈঠকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আশাবাদী কূটনীতিক মহল। দুইদেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, বর্তমান পরিস্থিতি, সংখ্যালঘু বিষয় ছাড়া আরও বেশ কিছু বিষয়ে আলোচনা হয়। যদিও মহম্মদ ইউনুস মিথ্যা তথ্য প্রচার, স্বৈরশাসক শেখ হাসিনার ভারতে অবস্থান, জুলাই-আগস্টের গণ অভ্যুত্থানের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। ভারতে চলা বাংলাদেশ বিরোধ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে মুহম্মদ ইউনুস পুরো বিষয়টাকেই অপপ্রচার বলে ব্যাখ্যা করে। বৈঠকের শেষে ভারতের বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি জানান, দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি চায় ভারত। পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক করার সদর্থক চেষ্টার বিষয়েও বার্তা দেওয়া হয়েছে। যদিও শেখ হাসিনার বিষয়ে কী আলোচনা হয়েছে তা অবশ্য কেউই জানাননি।

মহম্মদ ইউনুসের বিরুদ্ধে স্মারকলিপি জমা আইনজীবীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি।। বাংলাদেশের বর্তমান তদারকি সরকারের প্রধান মহম্মদ ইউনুসের আমলে হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে গত ৯ ডিসেম্বর শিলচরের ১০৭ জন আইনজীবী নোবেল শান্তি পুরস্কার কমিটির উদ্দেশ্যে একটি স্মারকলিপি সেখানকার জেলাশাসকের হাতে জমা করেন। মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন শাসনে ধারাবাহিকভাবে সংখ্যালঘু নির্যাতন, হিন্দুদের ধর্মীয় রীতি-নীতি পালনে বাধা, মানবাধিকার লঙ্ঘন সত্ত্বেও ইউনুসের নীরবতা প্রমাণ করেছে যে, তাঁর প্রাপ্ত নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রকৃত অর্থে প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়। এই বিষয়ে নোবেল শান্তি পুরস্কার কমিটির যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ভবিষ্যতে সতর্কভাবে আরও স্বচ্ছতা ও ন্যায়সঙ্গত উপায়ে সঠিক মূল্যায়নের মাধ্যমে উপযুক্ত ব্যক্তিকেই পুরস্কারের জন্য মনোনীত করার আবেদন করা হয়েছে স্মারকলিপিতে। এছাড়াও বাংলাদেশের ঘটনা নিয়ে কমিটির নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করারও আবেদন করা হয়।

এদিন জেলাশাসক মৃদুল কুমার যাদবের হাতে জমা দেওয়া স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর করেন বরিষ্ঠ আইনজীবী তথা শিলচরের প্রাক্তন পুর সভাপতি নীহারেন্দ্র নারায়ণ ঠাকুর, শিলচর বার সংস্থার সম্পাদক নীলাদ্রি রায়, আইনজীবী প্রসেনজিৎ দেব, ধ্রুবকুমার সাহা, প্রবাল দেব, অসমঞ্জ বিশ্বাস, অনিল চন্দ্র দে প্রমুখ।

স্মারকলিপি জমা দেওয়ার সময়ে উপস্থিত ছিলেন প্রবীন আইনজীবী শান্তনু নায়েক, রত্নাকর ভট্টাচার্য, ধর্মানন্দ দেব, সৌমেন ভট্টাচার্য ও বৈশালী ভাওয়াল।

উত্তরপ্রদেশের এটা জেলায় বিতর্কিত জমিকে ঘিরে জেহাদি আক্রমণ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ২৪ নভেম্বর উত্তরপ্রদেশের এটা জেলার জলেসর শহরে একটি দরগার কাছে অবস্থিত জমিতে নির্মাণ কাজকে ঘিরে স্থানীয় হিন্দুদের উপর নেমে আসে জেহাদি আক্রমণ। দরগার কাছে অবস্থিত ওই জমিটির মালিক হলেন অনিল কুমার উপাধ্যায়-সহ আরও কয়েকজন। মুসলমানরা এই জমিটিকে ওয়াকফ সম্পত্তি বলে দাবি করে। এই দিন ওই জমিতে নির্মাণ কাজ বন্ধ করার জন্য জেহাদিরা হামলা চালায়। হামলার নেতৃত্ব দেয় এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত রফিক। হামলায় গুরুতর আহতের সংখ্যা অনেক। ঘটনার পর দু'জন অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হয়েছে। ১৬ জন সন্দেহভাজনের পাশাপাশি প্রায় ১৫০ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে বলে সংবাদসূত্রের খবর। সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট বিপিন কুমার মোরল সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, যে জমিটিকে কেন্দ্র করে এই বিতর্ক তার সার্ভে নম্বর হলো ৩১৮১-৩১৯২। রেভিনিউ (ভূমি-রাজস্ব) রেকর্ড অনুযায়ী জমিটি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন। বংশ পরম্পরায় জমিটি ওই ব্যক্তিদের পৈতৃক সম্পত্তি। এছাড়াও দরগা কমিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে ও সম্মতিতে জমিটির চৌহদ্দি ও সীমানা ইতিপূর্বেই নির্ধারিত হয়েছে।

এটা জেলার এসএসপি (সিনিয়র সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিশ) শ্যামনারায়ণ সিংহ বলেন যে সংঘর্ষ থামাতে অতি সত্ত্বর ব্যবস্থা নেয় পুলিশ। গত ২৫ নভেম্বর এই হামলার মূলচক্রী রফিককে বিচারবিভাগীয় হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে স্থানীয় আদালত। তার সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়েছে আরেক অভিযুক্ত ফরমান ওরফে বান্টি। ঘটনার পর ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োগুলি থেকে পাথর ছোঁড়া এবং ভাঙচুরের ঘটনায় যুক্ত থাকা অপরাধীদের শনাক্ত করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সার্কেল অফিসার নীতীশ গর্গ। এই ঘটনায় জড়িতদের কোনোভাবে রেয়াত করা হবে না বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সম্ভলের পর এটা জেলায় হিন্দুদের ওপর ঘটলো জেহাদি আক্রমণ। সম্ভলের ঘটনায় ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে উত্তরপ্রদেশ সরকার। এই ঘটনায় সাতটি এফআইআর দায়ের করেছে রাজ্য পুলিশ। সম্ভলে সংঘটিত জেহাদি হিংসায় অভিযুক্ত হিসেবে এফআইআরে নাম রয়েছে সমাজবাদী পার্টির সাংসদ জিয়াউর রহমান বর্ক এবং স্থানীয় সমাজবাদী বিধায়ক ইকবাল মেহমুদের ছেলে সোহেল ইকবালের।

বাংলাদেশ জুড়ে চলছে ভয়াবহ হিন্দু নির্যাতন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বিশ্ব জুড়ে নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় উঠলেও বিরাম নেই বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনে। গত ৩ ডিসেম্বর বাংলাদেশের সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলা সদরে হিন্দুদের উপর চলল নৃশংস হামলা। আকাশ দাস নামক এক যুবকের বিরুদ্ধে সামাজিক মাধ্যমে মজহবের অবমাননার অভিযোগ তুলে জেহাদিরা হিন্দুদের গ্রামছাড়া করে ১৩০টি হিন্দুবাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা-সহ ২০টি মন্দির ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। লুঠপাট করা হয় হিন্দুদের শতাধিক দোকানে। হামলাকারীদের গ্রেপ্তার না করে বাংলাদেশ পুলিশ মজহবের অবমাননার অভিযোগে প্রফুল্ল দাসের পুত্র আকাশ দাসকেই গ্রেপ্তার করেছে। এদিন রাতে দোয়ারাবাজার উপজেলার সদর ইউনিয়নের মংলারগাঁও গ্রামে এই ভয়াবহ হামলার ঘটনা ঘটেছে। দোয়ারাবাজার উপজেলা সদরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় লোকনাথ মন্দিরের সাধারণ সম্পাদক খোকন রায় বলেন যে লোকনাথ মন্দিরে ভাঙচুর করা হয়েছে। মন্দিরের সম্পত্তি লুঠ করা হয়েছে। অন্তত ১৫ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বাজারে থাকা হিন্দুদের শতাধিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানেও হামলা, ভাঙচুর করা হয়েছে। উপজেলা পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সভাপতি গুরু দে'র বাড়ি, পারিবারিক মন্দির-সহ আশেপাশের আরও ১০টি বাড়িঘরে লুঠপাট করা হয়েছে। এছাড়া উপজেলার মংলারগাঁও এবং ননিগাঁও পূর্ব হাঁটিতেও লুঠপাট হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে।

সম্প্রতি গোপালগঞ্জে জেলার গহরডাঙ্গা এলাকায় মোল্লাবাদীদের জারি করা এক ফতোয়ায় জানানো হয়েছে— 'এখান থেকে শুরু হলো, এরপর পুরো বাংলাদেশে জারি হবে শরিয়তের আইন।' সেখানে জেহাদিরা প্রকাশ্যে মাইক নিয়ে মহিলাদের বাড়ির বাইরে না বেরোনোর ফতোয়া জারি করেছে। তারা বলেছে যে এবার থেকে মহিলাদের বাজারে আসা নিষিদ্ধ। কোনো মহিলা বাজারে হাজির হয়ে জিনিসপত্র কেনাকাটা করতে পারবেন না। দোকানদার ও ব্যবসায়ীদের হুমকি দিয়ে বলা হয়েছে যে মহিলারা বাজারে এলে তাঁদের ফিরিয়ে দিতে হবে। দোকানদাররা মহিলাদের কাছে কিছু বিক্রি করতে পারবেন না। দোকানের সামনে রাখতে হবে পর্দা। নমাজের সময় সেই পর্দা নামিয়ে দিতে হবে। নমাজের সময় কোনো দোকানেই বেচাকেনা করা চলবে না।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে যে কয়েকজন ব্যক্তি বাজার এলাকায় মাইকিং করছে। সেখানে দোকান চালু রাখতে হলে কী কী নিয়ম মানতে হবে, সেটা জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। 'দিন-ই-মাহফিল'-এর পরিবেশ বজায় রাখার জন্যই এই ফতোয়া সবাইকে মানতে হবে বলে ওই ঘোষণায় জানানো হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিয়োটি শেয়ার করে বাংলাদেশি লেখিকা তসলিমা নাসরিন বলেছেন যে এই প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশকে 'জেহাদিস্তানে' পরিণত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।